KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩৫/২ ৩৫/২	Year of Publication : শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০ মাঘ-চৈত্র ১৩৮০
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor দিলীপকুমার গুপ্ত	Remarks :

C.D. Rol' No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

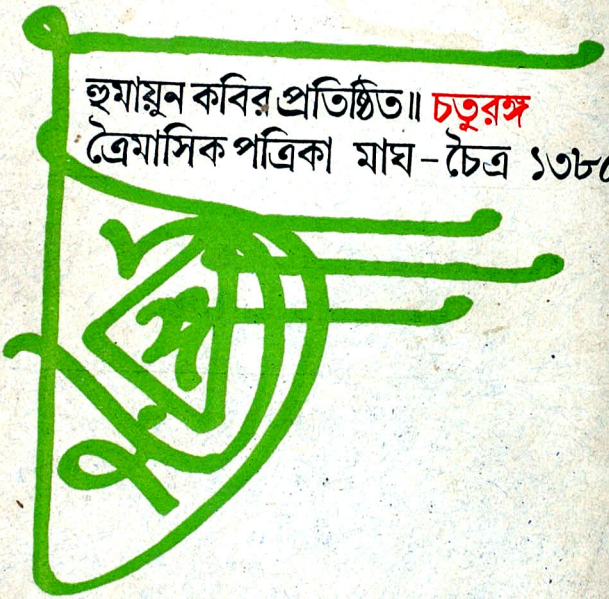

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৩৫ মাঘ-চৈত্র ১৩৮০

সূচিপত্র

অশোক মিত্র। কবিকাহিনী ২২৭
মণীন্দ্র রায়। বলবার যা ছিল ২৩৪
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। সময় সংক্রান্ত ২৩৫
জিয়া হায়দার। রক্ত করবী, বাংলা দেশ ১৯৭৩ ২৩৭
দিব্যেন্দু পালিত। হাওয়া এসে ডাক দেয় ২৩৮
রণেশ্বর হাজরা। এমনি আছি ২৩৯
অসীম রায়। আবহমানকাল ২৪০
মিহির সিংহ। বিজ্ঞান পরিকল্পনার ভূমিকা ২৬৭
রেণে দেকার্ত। রীতিবিষয়ক আলোচনা ২৭৭
সমালোচনা। অশ্রুকুমার সিকদার, নির্মল ঘোষ ২৯০

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

আতাউর রহমান কর্তৃক নালন্দা প্রেস, ১৫৯-১৬০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। বিজ্ঞাপন এবং কভার রে এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, ৫এ, ম্যাঙ্গ লেন, কলিকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি প্রগতি

স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজগতে যে অগ্রগতি হয়েছে তথ্যের নিরিখে আপনারা যাচাই করে নিন।

শস্যের নাম	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
	১৯৪৭-৪৮		১৯৭২-৭৩	
আউশ ধান	৫৫২·০	৩৮০·১	৮২৪·৮	৭৮৫·৭
আমন ধান	৩৩৪৬·৮	৩১৭১·২	৩৯৮১·৭	৪১৯০·৭
বোরো ধান	১০·২	৯·৬	২৬২·৯	৭২৮·৯
গম	৩৬·৭	২১·৮	৩৬৮·২	৬৮৮·০
ডাল	৪২১·৮	২৩৮·৮	৫৪৫·৬	২৮৪·৮
তৈলবীজ	১০৮·১	৪৫·৬	১৫০·০	৬৩·৭
পাট	১০৭·৮	৬৪৮·৭	৩৬৭·৩	২৬৯০·৮
		(হাজার বেল)		(হাজার বেল)
আখ (গুড়)	২৫·৬	১০২১·৫ (গুড়)	৩২·৫	১৬৪৩·৭ (গুড়)
আলু	৩০·৯	২৭১·৫	৭৫·৭	৯৪৮·৮

যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সেই কৃষকদের অভিনন্দন জানাই।

॥ পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার কর্তৃক প্রচারিত ॥

বর্ষ ৩৫ মাঘ-চৈত্র ১৩৮০

কবিকাহিনী

অশোক মিত্র

"মহাভারতের কথা" অসমাপ্ত রইলো, যে জীবনকাহিনী গত দু-তিন বছর ধরে গুচ্ছ-গুচ্ছ করে লেখা হচ্ছিল, তাও সম্পূর্ণ হলো না। বুদ্ধদেব বসুর দেহান্তরের শোকাবেশে এই দুই আক্ষেপ সবচেয়ে তীব্র হয়ে বিঁধ করবে। প্রত্যন্ত, এবং প্রত্যন্তে পেঁছুবার ইতিকথা, দুই-ই শিলালিপির বাইরে থেকে গেলো : বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের পক্ষে এই ক্ষতির কোনো পরিমাপ নেই। বুদ্ধদেব বসুর মানসিকতা, চিন্তা, ভাষা সবকিছুই "মহাভারতের কথা"য় এক পরমবিন্দুতে পেঁছুবার উপক্রম করছিল : কিন্তু শেষ শীর্ষে পেঁছুনো গেলো না, তার আগেই, নিয়তিলিখন, দরজায় ধাক্কা পড়লো। যে-বিচিত্র অভিজ্ঞতা-ইতিহাসের মধ্য দিয়ে চক্রমণ করে অবশেষে সায়ংসময়ে বুদ্ধদেব বসু উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সে-কাহিনীও সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত করছিলেন তিনি, একটু-একটু করে, স্মৃতিকে সন্তর্পণে লালন করে নিয়ে, আশ্চর্য সুখদায়িকা ভাষায়। তাও অসম্পূর্ণ থেকে গেলো।

এখন কিছুদিন জল ঘোলা থাকবে। আমাদের সাম্প্রতিক ঐতিহ্যে যা প্রধান ত্রুটি, নতুন করে তার পরিচয় পেতে থাকবো সবাই। জীবনানন্দ দাশ জীবদ্দশায় প্রায়-অনালোচিত থেকেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল-মহান সৃষ্টিকর্ম নিয়ে তন্নিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা হালেই যা শুরু হয়েছে। অবশ্য বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে, সেই পাঁচ দশক আগে থেকেই, তর্কের ঝড় উঠেছে প্রচুর, কিন্তু তাঁর রচনাদির বিশুদ্ধ, আবেগরহিত সাহিত্যবিচার আদৌ হয়নি। এখনও, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর, প্রধানত যে-ধরনের আলোচনা হচ্ছে, হবে, তা টীকা-টিপ্পনী গোছের, অনেকটাই প্রায় সামাজিক কর্তব্যবোধের তাড়নায়। এবং এই আলোচনায়, ধরেই নেওয়া যায়, ফের আবেগাধিক্য ঘটবে : বুদ্ধদেব বসু যেহেতু আমৃত্যু বিতর্কিত পুরুষ ছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবির আগে থেকেই তৈরি ছিল, তাঁর সাহিত্য-কীর্তির বিশ্লেষণে শিবিরভুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের অভ্যস্ত অভিমতগুলিই আরেক প্রস্থ পরিবেষণ করবেন, যে-যে আবেগগুলি তাঁদের পরিচয়সিক্ত, নতুন করে তাদের ধারাজলে স্নান করে নেবেন, করে নিয়ে ভারি তৃপ্ত বোধ করবেন। এই মুহূর্তে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। বরাবরই চিন্তার চেয়ে অন্ধ ঐতিহ্যাশ্রয়ের দিকে আমাদের আসক্তি।

বুদ্ধদেব বসুর প্রতি যদি যথাযথ কর্তব্য করতে হয়, তাহলে ছকের নিগড় থেকে বেরোনো প্রয়োজন। তাঁর সাম্প্রতিক মতাদর্শকে যাঁরা গভীরভাবে পছন্দ করতেন, তাঁদের দিক থেকে যেমন প্রয়োজন, বিশেষ করে তাঁর মতামতের জন্যই বিগত পঁচিশ বছর তাঁকে যাঁরা দুয়ো দিয়ে আসছিলেন, তাঁদেরও তেমনি। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর জন্য যে-স্থান নির্ধারিত থাকবে, তা কদাপি তাঁর মতাদর্শের জন্য নয়, মতাদর্শ ছাপিয়ে, মতাদর্শ পাশে সরিয়ে রেখে তাঁর সৃজনপ্রতিভার যে বিস্ফোরণ, ভবিষ্যতের পাঠক সে দিকেই মনোযোগ দেবে। আবার উল্টো করে এটাও তাই বলতে হয়, বুদ্ধদেব বসুর জীবনাদর্শ যদি ঘোর প্রতিক্রিয়াশ্রয়ী বলেও আপনার-আমার কাছে মনে হয়, তাহলেও তাঁর বিরাট সৃষ্টিকর্মকে অস্বীকার করবো কোন অধিকারে ? ইতিহাসকে ইচ্ছেমতো কেটে বাদ দিয়ে বিশ্লেষণ হয় না, বুদ্ধদেব বসুর মতামত যেহেতু অপছন্দ করি, অতএব তাঁর প্রতিভাকে আদৌ আমল দেবো না, এই যুক্তি মারাত্মক, এইজন্য মারাত্মক যে তা আত্মপ্রতারণার সামিল। নিজের মনকে চোখ ঠারলে আর যাই হোক, ইতিহাসের বিশ্লেষক হওয়া সম্ভব নয়।

কারণ, মানতেই হয়, রবীন্দ্রনাথের পর এমন সৃষ্টিশীল পুরুষ বাংলা সাহিত্যে আর আবির্ভূত হননি। বিচ্ছিন্ন বিচার নয়, সমস্ত-কিছু মিলিয়ে দেখুন। কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর প্রধান পুরুষ অবশ্যই বুদ্ধদেব বসু নন, জীবনানন্দ দাশ; উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা—স্বভাবপ্রতিভা—যে-কারো ধরাছোঁয়ার বাইরে; ছোটোগল্পে শরৎচন্দ্র তো আছেনই, তাছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রেমেন্দ্র মিত্রও হয়তো বুদ্ধদেব বসুকে ছাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আরো যে বিস্তৃত প্রান্তর পড়ে আছে, সেখানে বুদ্ধদেবের একচ্ছত্র অধিকার সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। প্রবন্ধ অন্নদাশঙ্কর রায়ও প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের ব্যাপ্তি আরো অনেক ব্যাপ্ত আয়তন জুড়ে। সাহিত্যালোচনায় বুদ্ধদেব বসুর স্থাপিত আদর্শ আজ পর্যন্ত শীর্ষশৃঙ্গে। সেই সঙ্গে মনে করুন শিশুসাহিত্য-কিশোরসাহিত্যে তাঁর অপরিমেয় কীর্তি। সবশেষে অথবা হয়তো সর্বপ্রথমেই, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয় তাঁর সম্পাদনা-আদর্শ। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হবে, বাংলা সাহিত্যে পলিমাটির উপর নতুন পলিমাটির আস্তরণ পড়বে, কোথাও ভাঙন দেখা দেবে, কোথাও নবশ্যামলিমার প্রলেপ পড়বে, কিন্তু যা আবহমান কাল ধরে টিঁকে থাকবে তা 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা-ঐতিহ্যের স্মৃতি। নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, শ্রদ্ধা, প্রেম, অবৈকল্য, নানা কষ্টিপাথরেই সম্পাদনার মান বিচার করা চলে। বুদ্ধদেব বসু সবকটি নিরীক্ষাই মহৎ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবেন, এটুকু বলা আদৌ যথেষ্ট হলো না, আরো অনেক-অনেক বলতে হয়। কারণ, 'কবিতা' পত্রিকা এবং তাঁর সম্পাদনা যদি বাংলা সাহিত্যের গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে উহ্য থাকতো, তাহলে সন্দেহ হয়, বাংলা কাব্য এখনো 'ক্ষণিকা'-'পূরবী'-ছোঁওয়া কোনো প্রথাগত পুনঃপৌনিক পরিবেশে আবদ্ধ থেকে যেত, বাংলা গদ্যালোচনা 'প্রবাসী'-'ভারতবর্ষে'র ব্যাকরণগত নিগড়ে নিহিত থাকতো, বাঙালির সাহিত্যরুচি-তথা-চেতনা সমকালীন পৃথিবীর সঙ্গে সাযুজ্যবন্ধন আবিষ্কারে অসমর্থ হতো। এই ক্ষেত্রে যে-বিপ্লব ঘটেছে, তার সূচনায় 'পরিচয়' ইত্যাদি অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকার প্রয়াস আমি অস্বীকার করছি না, বুদ্ধদেব বসুর অনবচ্ছিন্ন সম্পাদনাসাধনা তাহলেও অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সাহিত্যের মান ও আদর্শকে 'কবিতা' পত্রিকা হঠাৎ বেশ কয়েক যোজন এক ধাক্কায় এগিয়ে নিয়ে এসেছিল, যার প্রভাব অচিরে চারপাশে সংক্রামিত হলো, যা ঘটলো তা রুচির শ্রেণীগত রূপান্তর, ইতিহাসের এক সোপান থেকে বহু উঁচু

আরো এক সোপানে অবলীলায় ডিঙিয়ে পেঁছনো। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদনা, অথবা রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'-সম্পাদনা সমকালীন সাহিত্যচিন্তায় যে আলোড়ন তুলেছিল, বুদ্ধদেবের 'কবিতা'-কীর্তি তার অন্তত সমপর্যায়ের, কিংবা সম্ভবত শ্রেষ্ঠতর। কবিতাকে সাহিত্যসৃষ্টির পুরোভাগে উপস্থাপন করার মতো স্পষ্ট সাহসের বিকচন, পঁচিশ বছর ধরে সেই সাহসের জয়গানঘোষণা, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগে অভাবিত ছিল, হয়তো তার পরেও অভাবিত থেকে যেত, যদি না বুদ্ধদেব বসু তাঁর উদ্যমকল্পনার ঘোড়সওয়ারে দুঃসাহসী উদ্দামতার জিন চড়াতেন।

আস্থা যাঁরা ইতিহাসের প্রাগ্রসরতায় রাখেন, তাঁরা আবেগের বশে এই তথ্যগুলি বিস্মৃত হলে ইতিহাসকেই অপমান করবেন। অন্যদিকে যে-উগ্রপন্থীরা তথাকথিত মানবিকতাপন্থী রাজনীতির স্বার্থসিদ্ধিতে বুদ্ধদেবের সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে ব্যবহার করতে চাইবেন, তাঁদের আচরণও সমান অসমর্থনীয়। বিচারে মূল্যবোধের স্থান অবশ্যই আছে, আবেগের আদৌ নেই। বুদ্ধদেবের রচনা শৈলীসর্বস্ব, তাঁর বক্তব্য নিঃসার, স্থানে স্থানে প্রতিক্রিয়ালগ্ন, অতএব তিনি ইতিহাসের বিচারে অপাংক্তেয়, এই যুক্তি সর্বনেশে রকম দুর্বল। বস্তুনিষ্ঠ বিচারে চলে আসতে হয়। এমনকি যদি মেনেও নেওয়া যায়, শৈলীর বাইরে বুদ্ধদেবের যা-যা সৃষ্টিকর্ম, তারা কালের বিচারে টিঁকবে না, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে হয়, শ্রেফ শৈলীর চমৎকারিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর চত্বরে একদা জড়ো হয়েছিলেন বহু বহু প্রতিভাবান, যাঁদের কীর্তি শৈলীকে ছাপিয়ে-ছাড়িয়ে। কোরক এবং অন্তর্লীন শাঁসের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু যে-ব্যক্তি একদা 'কতদিন মনে মনে করেছি শপথ : ঘৃণারে করি না ঘৃণা'-র মতো অবিস্মরণীয় পংক্তি লিখতে পেরেছিলেন, তাঁকে তাঁর পরবর্তীকালীন বিচ্যুতির জন্য সম্পূর্ণ বরবাদ করে দেওয়া ঘোর ইতিহাসবিরোধী আচরণ। কারো-কারো মূল্যমানে পদ্ধতিটিকে যন্ত্রণাদায়ক ঠেকলেও, বুদ্ধদেব বসুকে বিচার করতে হবে তাঁর সমগ্র সাহিত্যসত্তার অভিজ্ঞানের সাহায্যে। যাঁরা তা করছেন না, মুখস্থ ব্যাকরণের ছকে দু-কথায় অন্তিম রায় লিখছেন, তাঁরা আসলে ইতিহাসের সঙ্গে তঞ্চকতা করছেন। কিন্তু ইতিহাস তো ভোলে না, ঠগদের চিনে রাখে।

অথচ বিরুদ্ধপক্ষেও সমান চতুরালি। বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টিকর্ম একটি প্রবাহ, কোনো মধ্যবর্তী লগ্নের মুহূর্ত থেকে তার সালতামামি শুরু করা মস্ত অসাধুতা। তাঁর সায়াহ্ন-বেলায় বুদ্ধদেব এক বিশেষ জীবনদর্শন বেছেছিলেন। তাঁর সামগ্রিক রচনায় একমাত্র সেই জীবনদর্শনেরই প্রতিভাস, এমন বললে অন্যায় অতিরঞ্জন হয়, বুদ্ধদেবের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তিকে সংকুচিত করে আনা হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে, বুদ্ধদেবের আত্মপ্রকাশের সেই প্রথম পর্ব থেকেই, বহু পাঠক ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা বুদ্ধদেব কর্তৃক উচ্চারিত দর্শন বা তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি, অথচ তাঁর রচনা সম্বন্ধে তাঁদের মুগ্ধতাবোধ অব্যাহত থেকেছে। কারো কারো কাছে বুদ্ধদেবের যে-কোনো অধ্যায়ের ভাবোচ্ছ্বাস তরল ঠেকেছে, অন্য কারো কাছে মনে হয়েছে তাঁর দার্শনিকচিন্তা বালখিল্য কপচানির সামিল, কেউ বা হয়তো সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন ক্ষুরধার নদী অনেক ক্ষেত্রে যেমন প্রবাহে অচঞ্চল থাকতে অপারগ, বুদ্ধদেবের সেই দশা : প্রতিনিয়ত বাঁক নিচ্ছেন এদিকে-ওদিকে, আবেগের বন্যায় কখনো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই প্রান্তের জনপদ, পরমুহূর্তেই হয়তো অন্যমনা হয়ে প্রতীপপ্রবাহ, ভেসে গেলেন সম্পূর্ণ অভাবনীয় কোনো গতির উদ্দেশে। এরই মধ্যে, এই এতগুলি যুগ ধরে, অথচ যা অচঞ্চল-নিটোল থেকেছে তা তাঁর কাব্যবোধ, ভাষার প্রতি মমতা, শব্দসৌকর্য সম্বন্ধে নিষ্ঠা,

সাহিত্যকলার প্রতিটি অঙ্গ লক্ষ্য করে ভাবনা-ডুবোনো প্রেম। সুতরাং কেউ যেন বুদ্ধদেব বসুকে রাজনীতির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না যান। সেটা এক দিক থেকে যেমন অযৌক্তিক, অন্যদিকে তেমনই আত্মঘাতী ব্যাপার হতে বাধ্য : কারণ তাঁর এক পর্যায়ের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আরেক পর্যায়ের রচনাকে ঘায়েল করার খেলাটি অত্যন্ত সহজসাধ্য। এ ধরনের চেষ্টা অন্য এক অর্থেও আত্মঘাতী, কারণ তা আমাদের মনকে বিচ্যুত করবে বুদ্ধদেবের রচনার সারাৎসার থেকে, ভাষার প্রতি, কবিতার প্রতি, শব্দের জাদুমন্ত্রিত কুহকের প্রতি যে বিরাট-বিশাল প্রেম তাঁর সমগ্র সৃষ্টিপ্রয়াসে ছড়ানো-ছিটোনো-জড়ানো, তা থেকে। মূল্যবোধের বিচারে যাঁরা ঘোরতম বুদ্ধদেবভক্ত, এমনকি তাঁরাও তো তা চান না। যাঁরা নিজেদের বুদ্ধদেববাহিনী বলে গর্ব করেন, তাঁরা কেন মোহান্ধ প্রদাহে এই ঐতিহাসিক অবিচারে তাহলে লিপ্ত হবেন ?

আমি নিজে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকগতিতে আস্থা রাখি। সেই আস্থায় নির্ভর করেই বলছি, বাংলা সাহিত্য তথা সংস্কৃতির পটভূমিতে বুদ্ধদেব বসুর সংস্থান-নির্ণয়ে ব্যক্তিগত দর্শনের তেমন উপযোগিতা নেই, সেই দর্শন যদি সততপরিবর্তনশীল না-ও হতো, তাহলেও থাকতো না। কারণ এই দর্শন-উপলব্ধি, ইতিহাসের নিয়মেই, ঘটনাপরম্পরার ব্যাপার।

হেঁয়ালি করছি না। আমার উক্তির মূল প্রতিপাদ্য সামান্য দুটো কথাতেই স্পষ্ট করা সম্ভব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব বসু বিংশ শতকের প্রথম দশকে, একই বছরে, প্রায়-হুবহু এক সামাজিক পরিবেশে জন্মেছিলেন, হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারে, মাতাপিতৃপুরুষ পূর্ববঙ্গীয়, আরো একটু বিশদ হতে গেলে এই তথ্যও পরিবেষণ করতে হয় যে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার উত্তরাধিকার তাঁদের দুজনেরই চেতনার-ধমনীর প্রবাহে। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের বিংশ শতকের প্রথমার্ধের দায়ভাগ তাই তাঁদের জন্মের ইতিহাসে বিধৃত। ভূমিস্বত্বভোগী বাঙালি উচ্চবর্ণীয় হিন্দু, কিন্তু বহিরাবহ অহরহ বদলে যাচ্ছে—বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-স্বাদেশিকতা, প্রথম মহাযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন-ভাবুকতা, ইংরেজি ভাষার প্রসাদলব্ধ উদারতর চিন্তার পরিমণ্ডল, তিরিশের দশকে বিশেষ করে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎকীর্ণ বেকারসমস্যা; অন্যদিকে পল্লীবাঙলায় নতুন আলোড়ন, নাগরিক নানা দ্বান্দ্বিকতার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে প্রজাপীড়ন, এই পীড়নহেতু নতুন আবর্তের সঞ্চার, দেশভাগ, শরণার্থীপ্লাবন, বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের চরম সংকটপ্রলয়ক্রান্তির লগ্ন, যার জের এখনো চলছে। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, কিন্তু জীবনধারা যেখানে ইতিহাসের চাপে বহুবিচূর্ণ, সেখানে চেতনা নিছক একটিমাত্র খাতেই প্রবাহিত হবার নয়। বিশেষ করে বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছর বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের পক্ষে আরক্ততম ঋতু : অনেক উথালপাথাল, অনেক টানাপোড়েন, অনেক পরস্পরবিরোধী চিন্তারআবেগেরস্বার্থেরস্বপ্নের আলোড়ন, অনেক আশাভঙ্গ—সেই সঙ্গে অনেক নতুন নেশায়-পাওয়া, অনেক লাঞ্ছনাতিক্ততাবোধ, কিন্তু পাশাপাশি নানা রঙের অনেক নতুন মোহও। যে-কোনো দেশে, যে-কোনো ক্রান্তির লগ্নে চেতনাকে এরকম যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে হয়, অপ্রতিরোধ্য এই যুদ্ধ। সময়কে যদি আয়ত করে আনা যায়, ভূতচৈতন্যবাদের প্রক্রিয়াকে যদি সম্পূর্ণতমরূপে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে এই যুদ্ধ বিশেষ-এক উপসংহারে না-পৌঁছে পারে না। কিন্তু তা তো অন্তিম ফলাফল। ইতিমধ্যে, যতদিন আবেগেরচিন্তারদ্বন্দ্বেরসংশয়ের সমরলীলা অব্যাহত, ইতস্তত বহু ঘটনাসম্পাত ঘটবে, কেউ এদিকে হেলে পড়বেন, কেউ ওদিকে। এই ভবিতব্য মধ্যবিত্ত উত্তরাধিকারের ললাটলিখন : একই সময়ে, সমান্তরাল অথবা আড়াআড়ি, মধ্যবিত্ত মানসিকতায় অনেকগুলি

বিচ্ছিন্ন দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়, যে-কোনো ঋতুতেই হয়, রক্তাক্ত-আরক্ত ক্রান্তির যুগে তো কথাই নেই। শেষ পর্যন্ত, কার চেতনার নৌকো ঠিক কোথায় গিয়ে ভেড়ে তা বেশ খানিকটা আকস্মিকতার ব্যাপার, কোনো বিশেষ মুহূর্তনিচয়ের পরিবেশের প্রভাবের ব্যাপার। ইতিহাসের নিয়ম কাজ করছে, মধ্যবিত্তের অস্থিরচঞ্চলউদ্বেল চেতনায় কারুকার্য সাধন করে যাচ্ছে, কিন্তু এই ভাস্কর্য সবক্ষেত্রে এক হয় না, হতে পারে না, এবং তার কারণও ইতিহাসসম্মত। ইতিহাসের বিচারে বৃহৎ সমাজপ্রবাহ যেমন ধ্রুব, কোনো ব্যক্তির মানসিকতা বিবর্তনের ইতিকথায় আকস্মিকতার সংস্থান প্রায় ততটাই ধ্রুব। এই আকস্মিকতার ঝঞ্ঝায় তাড়িত হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিরাট সৃষ্টিপ্রতিভাকে আপাত-নিরাসক্ত, আপাত-নির্লিপ্ত, অথচ গভীর মমতাঠাসা ইতিহাসের প্রয়োজনে নিযুক্ত করেন। অন্যপক্ষে, ঐ একই আকস্মিকতার ফেরে, বুদ্ধদেব বসু সংগোপন আতঙ্কে শিহরিত হয়ে ফিরে যান গ্রন্থাগারের অন্ধকার সুড়ঙ্গে, জনজীবনের রূঢ়-বাস্তব উদ্ঘাটনকে ছাই-চাপা দিয়ে, নিছক কথাকে, শব্দকে, ধ্বনিতরঙ্গকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকার বিস্ফারিত দুঃসাহস নিয়ে নিজেতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। অথচ দুজনেই কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম মানছেন; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুর যুগ্ম নজির অতীতের ইতিবৃত্তে পর্যন্ত অন্তত হাজার জায়গায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

যেহেতু ইতিহাস তার পূর্বনির্ধারিত খাতে বয়ে চলেছে, সুতরাং সমাজসংস্থিত ব্যক্তিরা স্রেফ অনড়, স্থাবর শালগ্রামশিলা, তা নয়। ইতিহাসে আমার-আপনার স্থান কোথায়, তার বিচার তথা সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত আমার-আপনার উপরই ন্যস্ত। আমরা, সমাজের অন্তর্ভুক্ত অগণ্য অসংখ্য ব্যক্তিরা, বিশ্লেষণ করি, নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ ব্যক্ত করি, বাছাই করি। যিনি বিত্তহীন শ্রমজীবী, বাছাইয়ের অধিকার তাঁর পক্ষে সীমিত; এ-ও বোধহয় বাড়িয়ে বলা হলো, আসলে শূন্য। শ্রমজীবীর বিত্ত নেই, উপচার নেই, আলাদা অস্ত্র নেই, তাঁর একমাত্র তূণ সংঘবদ্ধতা, অপর-অপর শ্রমজীবীর সঙ্গে জোট বাঁধা : হয় সমস্ত শ্রমজীবীরা পরস্পরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ইতিহাসের গতিকে ক্ষিপ্রতর করার জন্য এগিয়ে যাবেন, নয় তাঁরা আপাতত মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবেন, এর বাইরে তাঁদের কোনো বিকল্প প্রস্থান নেই। মধ্যবিত্তের আছে, থাকে : মধ্যবিত্ত এদিকে হেলতে পারেন, ওদিকে; তিনি বিত্তহীনদের দিকে এগিয়ে এসে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক জয়যাত্রার প্রতি আনুগত্য জাগাতে পারেন, বিতৃষ্ণায়-অবহেলায় মুখ ঘুরিয়ে উল্টোদিকে হেঁটে রওনা দিতে পারেন, অথবা, বিভ্রান্ত-বিহ্বল মানসিকতায় দীর্ণ হয়ে, স্তম্ভিত প্রত্যয়ে নিজের একান্ত গুহায় কোনো নিভৃততর নির্জনতার অন্বেষণ করতে পারেন। যে-কোনো মধ্যবিত্তকেই, বিশেষ করে ক্রান্তির মুহূর্তে, এই বাছাইয়ের কাজে লিপ্ত হতে হয়, এই কর্তব্য থেকে রেহাই নেই : সে-মধ্যবিত্ত যদি সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হন, তাহলে তো আরো নেই।

বুদ্ধদেব বসু যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তা নিয়ে নতুন করে কেচ্ছা কেঁদে লাভ নেই। সেই সিদ্ধান্তহেতু নিন্দা কিংবা সাধুবাদ, দুটোই তিনি যথাযথ কুড়িয়েছেন, যথেষ্ট সময় ভরেই কুড়িয়েছেন। বিগতকাহিনী নিয়ে চর্বিতচর্বণ এখন অর্থহীন, অক্ষমার্হ সময়ক্ষেপণ। সেই প্রসঙ্গ উপস্থিত উহ্য রাখাই শ্রেয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সৃষ্টির ধারাকে যে প্রান্তরপ্রান্তে সযত্ন প্রহরায় রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেলেন, ইতিহাসধারা তাতে আদৌ হতচকিত হলো না; এমনটা যে হতে পারে, ইতিহাসে তার পূর্ব সাক্ষ্য আছে। এই সত্যটি মেনে নিয়ে অতএব তাঁর প্রতিভার বিশ্লেষণ ও বিচার প্রয়োজন; যাঁরা তা না-করে তাঁকে অবজ্ঞায় পাশ কাটিয়ে যেতে চাইবেন, অন্যদিকে যাঁরা বড়াই করবেন বুদ্ধদেব বসু প্রগতির প্রক্রিয়াকে আদৌ

তোয়াক্কা না-করে, সামাজিক আচার-অনুশাসন সুতীব্র সচেতনতার সঙ্গে অবহেলা করে, ইতিহাসকে নিষ্ঠুর, কিন্তু নির্ভুল, বিদ্রূপ হেনে নিজের প্রতিভায় স্থিত থেকেছেন, দুপক্ষই তাঁরা সমান অবিমৃষ্যকারিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। ইতিহাসের প্রবাহ শখের অভিনয়ের ঠুনকো তলোয়ার নয় যেমন, একবগ্গা একরোখা ব্যাকরণও নয় : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-বুদ্ধদেব বসু এক যাত্রাবিন্দু থেকে শুরু করে কোন্ পৃথগীকৃত কলাপারঙ্গমতায় আলাদা-আলাদা স্থানে পৌঁছুলেন, ইতিহাসের গহনে সে-ঈষৎরহস্য সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত।

বুদ্ধদেব বসুর কীর্তির বিচার তাই ইতিহাসপ্রসঙ্গকে পাশে সরিয়ে রেখে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে, একা, হয়তো প্রায় তিনশো বছর এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সমকালীন অথবা পরবর্তী বিচারে তাঁর কাব্যসৃষ্টি যদি শীর্ষস্থান অধিকারের যোগ্য না-ও হয়, তাহলেও কবিতাপ্রীতি, কবিতার প্রতি মমতাবোধ, কবিতার অধিকারবোধ, প্রত্যেক বাঙালির অবচেতনের সংগোপনে যে-বোধ লুকিয়ে থাকে, তাকে উন্মোচিত-বিকশিত করার উদ্যোগে বুদ্ধদেবের তিতিক্ষা পরিমাপের বাইরে। একটি সম্পূর্ণ জীবন কবিতার প্রতি প্রেমে ব্যয়িত হয়েছে, রেখে-ঢেকে নয়, বুদ্ধদেবের সমগ্র সাহিত্যসত্তা কবিতাকে লক্ষ্য করে নিমগ্ন থেকেছে, বছরের পর বছর ধরে, ঋতুর পর ঋতু পেরিয়ে, শতকের পর শতকের সেতু ডিঙিয়ে। এমনকি গদ্যও কবিতার প্রাণায়াম হয়ে উঠেছে, গদ্য পড়তে-পড়তে প্রতিবার মনে হয়েছে, না, কোথাও অনুশাসনে গোলমাল দেখা দিয়েছে, এ তো গদ্য নয়, নিটোল গীতিকবিতা। উপন্যাসপ্রয়াসাদিতেও একই অভিজ্ঞতা : বুদ্ধদেবের উপন্যাস কদাচ ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের অভিযানকাহিনী, নক্ষত্রের কানে, উপন্যাসের তারা-ভরা আকাশের তলে, ঘুরেফিরে সেই একই গান, শব্দের পুঞ্জিত সমারোহ, কবিতা। বুদ্ধদেবের পৃথিবীতে কবিতার শেষ ছিল না কোনোদিন : তত্ত্বগত আলোচনা-সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা-রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা, যা-ই মনে করুন না কেন, চিন্তার আড়াল কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, প্রবন্ধের যূথবন্ধ সারি অচিরে তাদের পরিচয় বদলে ফেলে, তারাও কবিতা হয়ে যায়। বুদ্ধদেব শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত রচনাবলী আপনি হয়তো ছুঁয়ে-ছেনে দেখছেন, কিন্তু কবিতাকে চাপা দিয়ে রাখা অসম্ভব, তা উপ্‌চে উঠছে। ভ্রমণকাহিনী বা ‘ব্যক্তিগত’ প্রবন্ধ ? নামে কী এসে যায়, সব, সব কবিতাতে রূপান্তরিত, ফুলঝুরির মতো কবিতা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, আলোর ক্লান্তিহীন দিগ্বলয়, আলো, গান, মূর্ছনা, কবিতা আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ব্যাকরণের হিসেবে যা নাটক, কথোপকথনের উচ্চাবচতা পেরিয়ে যার অপ্রতিরোধ্য আবেগশীর্ষে পৌঁছুবার কথা, বুদ্ধদেবের প্রতিভার স্পর্শে তা পর্যন্ত অন্য আদল নিয়েছে, নাটক কখন কবিতার শরীরে মিশে গেছে। তাছাড়া, তাঁর সম্পাদনা-আদর্শ, যে-প্রসঙ্গে এর আগে উল্লেখ করেছি, সে-আদর্শের অভিলক্ষ্য তো, সেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এক স্থিরবিন্দু : কবিতা, কবিতাই সৃষ্টি, কবিতাই সাহিত্য, সাহিত্য কবিতা, জীবন জড়িয়ে কবিতা, জীবন পেরিয়ে কবিতা, কবিতা অবজ্ঞার বাইরে, তাচ্ছিল্যের বাইরে, কারণ কবিতার সুষমা ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব। মানুন না-মানুন, আপনি অভিভূত হোন না-হোন, কবিতার আড়ালে মাঝে মাঝে যে-চিন্তার প্রলেপ তা আপনাকে বিচলিত করুক না-করুক, এই মহৎ পরিচিকীর্ষার তুলনা কোথায় পাবেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ? বুদ্ধদেবের কাব্যধর্ম দিনের সায়াহ্নসময়ে, “মহাভারতের কথা”-র আধারে পরিপূর্ণতম আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। কবিতার আবেগ তার সমস্ত তরঙ্গলীলা নিয়ে উপস্থিত, কিন্তু সে-তরঙ্গে কী করে যেন এক আশ্চর্য শান্ততাও হঠাৎ যুক্ত হয়েছে। কবিতাতে দীপ্তি, প্রাখর্য, অগ্নি, কিন্তু এ-আগুনে জ্বালা নেই, চন্দনের

সমাহিত প্রলেপ। মহাভারতের বিচিত্র চরিত্রেরা আসছেন, যাচ্ছেন, তাঁর ঔদার্যমহত্ত্ববীর্যশৌর্য-অভিমানরাগবিরাগক্রূঢ়তাখলাচারক্ষমাপ্রেমঅভীপ্সাঅবসাদঔদাসীন্য দপ করে জ্বলছে, নির্বাপিত হচ্ছে, ফের আরেকবার অভ্যুদিত হচ্ছে, আবার নিষ্কাশন-প্রস্থান : পুরাণ দর্শনে রূপান্তরিত হচ্ছে, দর্শন শাস্ত্রকলায়, শাস্ত্র ইতিহাসঅভিজ্ঞানে, ইতিহাস সমাজাচারে, সমাজতত্ত্ব কোনো গার্হস্থ্যকাহিনীতে, কিন্তু সব-কিছুই যেন উপলক্ষ্য, বুদ্ধদেব যেন “মহাভারতের কথা”-র নির্ভরে তাঁর সারা জীবন ধরে যে স্বধর্মে নিযুক্ত থেকেছেন, কবিতা, সেই কবিতার গভীরে, সেই কবিতার চারদিকে ঘিরে, জুড়ে, সেই কবিতায় অবগাহিত হয়ে আমাদের ইশারায় ডাকছেন, আমরা যেন যোগ দিই, আমরা যেন তার প্রতি অনুকম্পায়ী হই, আমরা যেন কবিতার প্রতি অনুকম্পায়ী হই, আমরা যেন কবিতাকে চিনি, জানি, কবিতাকে প্রতি ঋতুতে, প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্তে যেন আলিঙ্গন করে বলি : প্রসঙ্গ উহ্য, তুমি যেখানে উপস্থিত, আকাশ সেখানে গান হয়ে গেছে।

কিন্তু, ভবিতব্য, গান শমে পৌঁছুলো না, “মহাভারতের কথা”-র কবিতা দিগন্তবলয়ে উপনীত হবার আগেই স্তব্ধ হলো, এখন শুধু এক মুহ্যমান নীরবতা। জীবিকার নোংরা ধান্দায় কবিকেও ব্যয়িত হতে হয়, সময় বয়ে যায়। বুদ্ধদেবের সময় কতিপয় তস্কর চুরি করে নিয়ে গেলো, কবিতা অসমাপ্ত রইলো। বুদ্ধদেব বসুর জীবনে মৃত্যুর অভ্যুদয়, শীতের প্রার্থনা যখন অসমাপ্ত, অকরুণ রূঢ়াচরণ। অথচ কোনো প্রতিকার নেই : অতি শোকগ্রস্ত তাই এ কবিকাহিনী।

বলবার যা ছিল

মণীন্দ্র রায়

বলবার যা ছিল
কবেই তো টাঙিয়ে দিয়েছি ড্রইংরুমের ফ্রেমে।
এখন কি আর মানায়
দীঘির ঝাঁজিদামের স্বচ্ছ কুহকে
পুঁটিমাছের রুপোলি বিচরণ?
এখন কি আর সময় কাটানো যায়
উঠতি যুবতী গা-ঘেঁষা বিকেলে ময়দানের নিরিবিলিতে?
জাদুঘরের লুপ্ত-প্রাণীর বিশাল চোয়ালের উলংগতায়
উদ্যত হয়ে আছে গ্রীক-ট্র্যাজেডির নিয়তি।
এখন শুরু হবে একশ' ফুট শূন্যের ভাঁবুতে
ট্র্যাপিজের খেলা।

বলবার যা ছিল, তা তো
উৎসবের রোশনাই সাজিয়ে
কবেই পার হয়ে গেছে রাস্তা।
মিনিটগুলো এখন এমন নীরেট যে
মাথা ঝাঁকালে শব্দ ওঠে আথরোটের মতো।
কী হবে আর মনকে চোখ ঠেরে?
বাজনাগুলো এখন একসংগে বেজে উঠে
থেমে যাবে হঠাৎ
একসংগে।

বলবার যা ছিল, শোনো
নিজেরই হৃৎপিণ্ডের হাতুড়ি
নিজের বুকে॥

সময় সংক্রান্ত

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ছিল মাঠ ইতিমধ্যে নদী
আরশিনগরের সেই মাঠে
বারো মাসই স্বপ্নের চাষ হতো
ঘাটতি ছিল না অসংখ্য গোপন ফুলের
নিঃশব্দ কাকলি ছিল অন্তহীন
অতল জলের আহ্বানে
রবীন্দ্রসংগীত নিরন্ত নির্ঝরিত
অলৌকিক সেই মাঠের বাগানে
রূপ নেহারনু হম জনম অবধি

ক্রমে ক্রমে
মন ধসের, চোখ ঝাপসা
স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
সবুজে হারায় হলুদে লাল হয় শাদা
হলা পিয় সহি
চিনিবে না চিনিবে না
মরদেহে লুপ্ত বরতনু

ছিল মাঠ এখন নদী
ছলছল ছলছল এক নৌকোর দাঁড়ের মন্দাক্রান্তায়
সময় ভাঙতে
ভাঙতে
ভাঙতে ভাঙতে
নদী সেই সমুদ্রপ্রতিম

আজ
আকাশের স্লেট আরও বড়ো
আর আমার মুখে
নক্ষত্রের বর্ণমালার উচ্চারণও
অনন্য অন্যতর

(দিন দুই বাদেই কি পূর্ণিমা ?)
হলা সউন্দলে
আমার স্মৃতিতে অল্প কয়েকটি পূর্ণিমাই অবশিষ্ট আজ

ছলছল ছলছল শব্দ
দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো
আরশিনগরের মাঠের উদ্যানে
হয়তো এখনও স্বপ্নের চাষ হয়
নদীর ওপারে সেই মায়াবী বাগান
আঁধার নির্জন এপারে আমি দাঁড়িয়ে
একলা ভীষণ একলা

আমি সাঁতার জানি না

রক্তকরবী, বাংলাদেশ ১৯৭৩

জিয়া হায়দার

কিশোরের ভালো লাগে রক্তকরবীর রৌদ্র, তাই
কিশোর অমন করে ডাক দিয়ে ফেরে শুধু—নন্দিনী, নন্দিনী;

ছিন্নবাস উন্মাদিনী নন্দিনীর নিতেল কুন্তল,
বিশ্বাসের পৃথিবীতে বিশাল আঁধার,
রুদনে নিরুদ্ধ কণ্ঠ নিরন্তর ডেকে যায়—রঞ্জন, রঞ্জন;

বর্তমান রাজা তার স্বর্ণগৃহা থেকে
সংগী ক্রুর অন্ধ অপচ্ছায়া,
দাঁড়ালেন তাঁরি সৃষ্ট মরুর সিঁড়িতে;

বিশু পাগলা, ফাগুলাল—মৃত আত্মাদল
আশ্রয় সন্ধান করে রক্তকরবীর নষ্ট কুঁড়ির ভেতরে।

হাওয়া এসে ডাক দেয়

দিব্যেন্দু পালিত

হাওয়া এসে ডাক দেয় অবেলায় আশ্লেষের কানে—
পুনর্বার আসা হলো, মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে ?

তাকে খুলে দিই জামা, ঘর্মাক্ত শরীর, বয়স,
আনুপূর্ব ইতিহাস, জন্মরাশিচক্রে যার শুরু ছিল তাজা—
কর্মের সৌজন্যে পাওয়া পার্থিব বিচরণ আর
অপুণ্যে অর্জিত মেধা, মুখোশের সৌকর্য এবং
চাপা কিছু অহঙ্কার, নিম্নাভিমুখী সংলাপ
যা পারে নির্ভর হতে অভিজ্ঞতাময় এ-স্মৃতির।

সর্বজনীন এই অন্ধকার ক'রে তোলে দৃষ্টিও প্রখর—
সুড়ঙ্গবাহিত পথে একে-একে যাত্রা করে শুরু
তৃতীয় পুরুষে ব্যাপ্ত নারীর শরীরী প্রেম, বাতিল লতার
সমাপ্ত সবুজ রস, ঘুমঘোরে ক্লান্ত পুরুষের
হতবুদ্ধি আর্তনাদ আর শিশুদের জন্ম গভীর প্রত্যূষে—
আলো-আলো অন্ধকার, ছায়া নয়, অথচ প্রাকৃত
যন্ত্রেও পড়ে না ধরা সে-আকার, সেই নিরাকার।

হাওয়া এসে ডাক দেয় অবেলায়, কিছু মনে পড়ে ?
আশ্লেষে আমার জন্ম মৃত্যু নয়, মৃত্যুও কি নয় !
নাকি স্মৃতি বলতে এই ফণিমনসায় লব্ধ ছবি—
ফুল না, ফুলের মতো; গন্ধের আদর থেকে প্রিয়
আত্ম-হন্তারক খুশী !
বসন্তকালীন আভা ঘিরে থাকে চতুর্দিক, বহে যায় হাওয়া
শুধু আশ্লেষের দিকে : মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে ?

এমনি আছি

রত্নেশ্বর হাজরা

আমি আছি অথচ আমার অস্তি আর অহংকার
সমার্থক নয়। এই
—এদিক থেকে ওদিক—প্রাচীন গ্রীষ্ম, আর
ফসলহীন মাঠ কুয়াশার মধ্যে—একইভাবে দেখা হয়
এক কিংবা দুই কিংবা তিনের সংগে......

আমি আছি অথচ
আত্মহত্যা করে সে ফিরে যায় অন্যদিকে, তার
ফিরবো না ফিরবো না চিহ্নগুলো
ছত্রখান হয়ে পড়ে রাস্তায়—
আমার শেষ অহংকার বিবর্ণ হয় তখন—আর
সেই অন্ধকারে শাদা বকের পালক নিঃশব্দে ঝরে পড়ে।
আমি আছি
তবু নিজের জন্য শোক পালন করতে পারি না একদিনও, অথচ
চেয়েছিলাম নিজের কণ্ঠেই নিজের জন্য
গভীরতম দুঃখ উচ্চারিত হোক......

শুকনো মাটির উপর জল ঢেলে পড়ে আর আমার চক্ষু
ভিজে যায়—
ত থেকে তখন শুধু তৃষ্ণা......তৃপ্তি নয়......শুধু তাপ......
আমি আছি—অথচ সেই অহংকার
বর্ণময় হয়ে উঠল না একদিনও। অনুষ্ঠানের দিন
কোনো ধর্ম আমাকে ধারণ করল না। আমি আছি অথচ
আমার অস্তি আর অহংকারের উপর বিবর্ণ পালক ঝরে পড়ে রোজ, আর
একইভাবে দেখা হয়
এক কিংবা দুই কিংবা তিনের সংগে...........

আবহমান কাল

অসীম রায়

—বারো আনা করে মাছের সের মশাই, লোকে খাবে কী?—মুখার্জীবাবু ঘন-ঘন তাঁর নিম্নাঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বললেন।

—হ্যাঁ, জিনিসপত্রের দাম বড্ড আক্রা হচ্ছে, ভবনাথও বললেন।

—আক্রা কী বলছেন মশাই! ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বলেন, আট আনা করে দুধের সের! কলকাতায় মানুষ থাকে? সেদিন একটা পাকা ফুটি দর করলুম মশাই হাতিবাগান বাজারে—আমার ওয়াইফের আবার ফল নাহলে চলে না—ব্যাটা বলে কিনা ছ-আনা! সব যুদ্ধ, সব এই যুদ্ধের জন্যে। তারপর আবার তো শুনছি, কংগ্রেস উঠেপড়ে লাগবে। তার মানে বুঝেছেন তো? রাজায় রাজায় যুদ্ধ, আর আমাদের মতো উলুখড়ের প্রাণটা যায় আর কি।

ভদ্রলোক নিরবিচ্ছিন্ন বকে যান এবং নিরবিচ্ছিন্ন শুনে যান ভবনাথ। আর উদয়াস্তও নয়, সকালে শয্যাত্যাগ থেকে রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বাজার করে চলেন স্বর্ণসুন্দরী। এর মধ্যে চায়ের শেয়ারগুলো বিক্রি হয়ে যায়। সেগুলো রূপান্তরিত হয় গৌরীর ব্রেসলেট, হাতের চুড়ে, চুড়ির গাছায়, সীতাহার মটরমালায়, মুক্তোর সেটে। দেখা গেল, গয়নার ব্যাপারে গৌরীর আগ্রহ অপরিসীম। স্বর্ণসুন্দরী একটু ভুল বুঝেছিলেন, সেজন্যে জড়োয়ার ব্যবস্থা করেন নি। কিন্তু বিয়ের দুদিন আগে গৌরী বললে,—দিদিকে যে জড়োয়ার সেট-টা দিয়েছিলে মা, সেটা দেখতে ভারী সুন্দর। কাজেই হাঁফাতে হাঁফাতে স্বর্ণসুন্দরী ছুটলেন ওপাড়ায় গয়নার দোকানে। আর এই সমস্ত অভিযানে সঙ্গী টুটুল। টুটুল এ কদিন ছোটাছুটিতে ধুঁকসে গিয়েছে। তারপর যখন শুনলে, সন্ধ্যেবেলা আবার গাড়ি এসেছে, কারণ বিয়ের লাল বেনারসীই যথেষ্ট না, আর একটা স্কাই-ব্লু কিংবা বটল-গ্রীন বেনারসীর অভিযানে মা বেরোবেন, তখন সে বেঁকে বসল। হাতপা ছুঁড়ে চীৎকার জুড়ে দিল,—আমি পারব না। বিয়ে মানে খালি শাড়ি আর গয়না, আর কিচ্ছু না!

স্বর্ণসুন্দরী অবাক হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। গত দুবছরে অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে টুটুল। বয়ঃসন্ধির দরুন গলা ভাঙছে। ভয়ানক হেঁড়ে গলা লাগে টুটুলের।

—তুই-ই তো আমার হাতনাড়ু। একটা হাতনাড়ু তো থাকবে, বল।

টুটুলের উৎসাহে ভাটা পড়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে,—কাল কিন্তু আর তোমার হাতনাড়ু হব না।

—কেন, কাল কী রে?

—বালতিবাবুর বাড়ি যাত্রা।

বালতিবাবুর বাড়ি মানে বালতিব্যবসায়ী অক্ষয় হালদারের এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা বর্ধিষ্ণু বাড়ি। সে বাড়ির বিরাট চত্বরে 'বিদ্যাপতী' হবে।

—নাঃ, কাল আর বেরোব না। স্বর্ণসুন্দরী আশ্বাস দেন।

পরদিন সন্ধ্যায় সবুজ শাড়ি পরে বুকে নারকেলের মালা এঁটে যে ছোকরাটি অনুরাধার পার্ট করলে তাকে দেখে টুটুল আবেগে বিপর্যস্ত। সম্প্রতি লোকমুখাৎ সে খবর

পেয়েছে যে প্রত্যেক মহাপুরুষেই ডায়েরি রাখেন তাঁর মহৎ চিন্তা ও কাজের। একটা রুলটানা, স্কুলের পুরনো খাতায় সেও ডায়েরি লেখা শুরু করেছে। পরদিন সে মুখ গুঁজে লিখে চলে। ওদিকে মাছমাংসের বায়না নেবার লোক, ছাতে ভিয়েন বসাবার জন্যে জগন্নাথ ঠাকুর—যে কমলার বিয়েতেও লেডিকেনি আর বোঁদে করে তারিফ পেয়েছিল, শতকরা পনেরো টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েও কাজ করতে উন্মুখ পাড়ার নির্মল ডেকরেটার, পানের জন্যে রামলাল, মায় ফুলশয্যায় ফুলের সেটের জন্যে লোক হাজির। ভবনাথ হিমসিম খেয়ে যান। ইতিমধ্যে কোথা থেকে ভুঁড়িবাবুর উদয়। ভীষণ মোটা আর ভাবগম্ভীর হয়ে পড়েছে ভুঁড়িদা। ভবনাথকে বললে,—একসপোর্ট-ইমপোর্টে ব্যবসা করছি ছোটমামা। এক মুহূর্ত ফুরসুত নেই। নেহাত বোনের বিয়ে বলে এলাম।

পরদিন সকালে গয়নাগুলো সব শেষ বারের মতো পরীক্ষা করে স্বর্ণসুন্দরী নতুন সুটকেসে ভরছিলেন। পাশে গৌরী নিজের মনে কী ভাবছিল, কিন্তু প্রত্যেকবার এক-একটা গয়না যেই উঠছে অমনি সেদিকে তার চোখ চলে যাচ্ছে।

পেছনে বুড়ী এসে দাঁড়াল। তার চোখ খুশিতে ঠাট্টায় ঝলমল করে। প্রথমে গুনগুনিয়ে তারপর গলা ছেড়ে নেচে নেচে গান করে,

'আমার সোনার হরিণ চাই,
তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।'

—চুপ কর, চুপ কর, কাজ করতে দে, স্বর্ণসুন্দরী ধমকান।

ভুঁড়িদা বিয়ের সমস্ত ব্যাপারেই কর্তৃত্ব করতে চায়। সে যে কলকাতায় বেশ কয়েক-বছর ধরে বাস করছে আর তার সম্পন্ন মামা মাত্র আনকোরা আমদানি, একথাটা উঠতে-বসতে জানিয়ে দেয়। বিয়ের চিঠিগুলো স্বর্ণসুন্দরীর মুখের সামনে নাড়াতে নাড়াতে বলে,—এগুলো আজকাল আর চলে না। এইসব ডাব মণ্ডলঘট। আমার এক ফ্রেন্ডের বিয়েতে সেদিন চিঠি করে দিলাম। ক্রিসনের ওপর গোল্ড, লেটারিং দিয়েই মাত!

এমন সময় ছুটতে ছুটতে চোঙা ঘরে ঢোকে। তার হাতে একখানা খাতা, পেছনে টুটুল।

—আপনারা সবাই শুনুন। মহাপুরুষের জীবনী। টুটুল তার ঘাড় ধরে ঝুলে পড়া সত্ত্বেও সে 'বিদ্যাপতী' যাত্রার বর্ণনা পড়ে যায়। তারপর হাত ছাড়িয়ে লাফ দিয়ে খাটের ওপর উঠে উপসংহারটা চেঁচিয়ে পড়ে—'আজ হইতে জানিতে পারিলাম, স্বর্গীয় প্রেম পার্থিব প্রেম হইতে কত মহৎ।'

হাসির পটকা ফোটে। গৌরী গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে। টানাটানিতে খাতা ছেঁড়ে। টুটুল কেঁদে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে দাদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পড়পড় করে কয়েক গাছা চুল তুলে ফেলে। চোঙা সম্প্রতি আমেরিকান সিনেমাতে যেরকম বক্সিং দেখেছে সেই কায়দায় একটা লেফট ঝাড়ে ভাইয়ের চোয়ালে। তারপর জড়াজড়ি।

—একেবারে গুণ্ডা! একেবারে গুণ্ডা! গুণ্ডামি করতে হলে রাস্তায় যাও, বুড়ী গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচায়।

মুখার্জীবাবু বারান্দার এককোণে দই-রাজভোগ সাঁটিয়ে যাচ্ছিলেন। বিয়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই রসনার এই পৌনঃপুনিক আরাম থেকে নির্বাসন এগিয়ে আসছে ভেবে দুবেলাই যাতায়াত করছেন ভুঁড়িদার আপত্তি সত্ত্বেও।

—এইসব প্যারাসাইটদের কেন যে মামীমা স্থান দেন! প্রকাশ্যেই বললে ভুঁড়িদা।

মুখার্জীবাবু যেন কথাটা লুফে নিয়ে বললেন,—প্যারাসাইট আমরা সবাই ভুঁড়িবাবু। কেউ বেশি, কেউ কম।

তারপর মালবাবু বলে কোটিপতি এক বঙ্গসন্তানের একমাত্র পুত্রের বিয়ে দিয়ে তিনি যে ফ্যাসাদে পড়েছিলেন সে কাহিনীর বর্ণনা।—আমাকে বলে কিনা মশাই পার্টনার করবে, কোনো রিসক নেই! কে বলুন ওসব ফ্যাসাদে যায়! আমার যেরকম চলছে ভগবানের ইচ্ছায়.....ঘন ঘন থোড়া আন্দোলনে কথা হারিয়ে যায় মুখার্জীবাবুর।

বিয়ের আগের রাত। ছাতে বাঁশের খাঁচার ওপর থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ।

—তুই আজকাল আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন রে? গৌরী বলে তার ছোট ভাইকে।

—এবারে তো আর নেই, টুটুল বললে।

গতবার ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের ছোকরাটিকে প্রত্যাখ্যান করার কারণটি একমাত্র টুটুলের কাছেই প্রকাশ করেছিল গৌরী।

—তোমার ভয় করছে না দিদি?

—ভয়? কেন?

—লোকটাকে জানো না, চেনো না, তার সঙ্গে এতদূরে চলে যাবে!

—দূর পাগলা!

তারপর অন্যমনস্ক হয়ে ছাতের আলসেতে গা লাগিয়ে নিজের মনে বলে,—ভয় করলে কি চলে।

দিদির বিয়ের স্মৃতি বহুদিন পর্যন্ত টুটুলের কাছে চিংড়িমাছের মালাইকারির গন্ধ। গৌরীর যৌবনজ্বালা ও তা নিরসনের চেষ্টা, ডক্টর প্রদীপ্ত বোসের ভারতীয় রমণীর আত্মার সন্ধান, ভবনাথের আর বিশেষ করে স্বর্ণসুন্দরীর কন্যাদায়মুক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবনা (জার্মান ইউ-বোটের খপ্পরে আবার গৌরীদের জাহাজ পড়বে না তো?)—এ সমস্ত কিছুই তার কৈশোরের জগতে বাহ্য।

আর মালাইকারির গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হাজার খানেক লোকের হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ছাতে ওঠানামার স্মৃতিও ভুলবার নয়। গরদের পাঞ্জাবিতে জামাই-বাবুর লম্বাচওড়া শরীরখানা ভালই লাগছিল। কিন্তু বিয়ের আসরে সেই লোকটা কিংবা বেনারসীজড়োয়ামোড়া দিদি নায়ক নায়িকা নয়। অনেক লোক, অনেক মুখ, তারাই নায়ক নায়িকা। তার মধ্যে যেমন স্বর্ণসুন্দরীর এক দূরে সম্পর্কের মামা হাইকোর্টের জজ, যাঁর গিলেকরা ফিনফিনে পাঞ্জাবির ভেতর থেকে বুকের লোম এক নজরেই চোখে পড়ছিল; পাড়ার মুখার্জী ডাক্তার—ভবনাথের একই দেশে যাঁর বাড়ি এবং যিনি তাঁর ওয়াইফের লাউডগার সঙ্গে ইলিশ মাছ রাঁধার প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন, অথবা লক্ষ্ণৌ পাঞ্জাবি আর চুস্তপরা, কব্জিতে মালাঝোলানো কতিপয় চ্যাংড়া মাস্তান—যারা নিজেদের মধ্যে নাকি সুরে পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত গাইছিল; শানাইওয়ালার ফুলো গাল, মায় অধিক রাতে ফুটপাথে কাঙালীভোজন ও এঁটো পাতা নিয়ে নেড়ি কুকুরের কাড়াকাড়ি—এইগুলোই ঘুরেফিরে বহুদিন পর্যন্ত মনে থাকে।

সম্প্রতি ক্লাসে 'নদীবক্ষে ভ্রমণ' রচনা লেখায় টুটুলের নামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে।

ললিতবাবু—যিনি পরীক্ষা নিয়েছিলেন এবং দু-তিন বছর পরই যাঁর পদোন্নতি হয়েছিল কলেজের অধ্যাপকরূপে—তাঁর কাছে ফাঁকিটা যে ধরা পড়ে নি তা নয়। বস্তুত ভাবে ও ভাষায় প্রায় সবটাই টুকলি। কিন্তু যে কারণে বিস্মিত হয়েছিলেন ললিতবাবু তা হল এই বয়সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিচিত্র প্রবন্ধে"র একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ এমন আত্মসাৎ করার কৃতিত্ব। রচনায় কুড়িতে সাড়ে উনিশ পেয়েছিল টুটুল।

টুটুলের আর-একটি জয়যাত্রার ক্ষেত্র ইংরেজি ক্লাস। ইংরেজি ক্লাসের বীরেনবাবু চাপা ভর্ৎসনামিশ্রিত শ্রদ্ধায় তাঁর এই ছাত্রটিকে প্রশ্ন করেন। আর সব কিছুই এ ছাত্রটির নখদর্পণে। ক্লাসের সব ছেলে একের পর এক বেঞ্চির ওপর দাঁড়ালেও অনিন্দ্য কখনও দাঁড়াবে না—এরকম ধারণা ক্রমশ ক্লাসে চালু হয়ে যাচ্ছে। সেদিনও ইংরেজি ক্লাসে ফরাসী বিপ্লব টুটুলের এই জয়যাত্রার বিজয়কেতন তুলে ধরল।

'আব্রাহাম লিঙ্কন' শীর্ষক প্রবন্ধে ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশানের উল্লেখ থাকায় একের পর এক ছেলেদের প্রশ্ন করা হয়। অনেকেই চুপ, কেউ কেউ 'ইট ইজ এ রেভল্যুশান' বলে মাথা চুলকায়। আর টুটুলকে দেখায় এমন একজন গোলন্দাজ বাহিনীর নায়ক যার অব্যর্থ গোলায় শত্রুপক্ষের অস্ত্রাগার মুহূর্তেই হবে ধূলিসাৎ। বীরেনবাবু সেই অপেক্ষমান অব্যর্থ গোলন্দাজের চোখের দিকে না চেয়েই তর্জনী হেলান, 'ইউ?'

গোলন্দাজ উঠে দাঁড়ায়। 'দা অপ্রেশান অব দ্য পুওর, দ্য আনডিউ এক্জ্যাক্শান অব ট্যাক্সেস এট্সেটরা ক্রিয়েটেড এ গ্রেট রেভল্যুশান ইন ফ্রান্স। দ্য চিচিংস্ অব ভলটেয়ার অ্যান্ড রুশো ইন্সপায়ার্ড দেম্ অ্যান্ড দ্য রেসাল্টিং টাইড অব পিপলস ইমোশান...!

—এক্সেলেন্ট! এক্সেলেন্ট! ফ্যাকফেকে ফর্সা ক্ষয়া বীরেনবাবু তাঁর আপাত রুক্ষ চেহারা কিন্তু অসম্ভব কোমল দুই চোখ মেলে চেঁচিয়ে ওঠেন।

এ সাফল্যের আসল নায়ক কিন্তু টুটুল-চেঙার গৃহশিক্ষক অনন্তমাস্টার—যিনি দাবানলের মতো গৃহে গৃহে শিক্ষকতায় আগুন ছড়িয়ে চলেছেন। বোধহয় নিজেও অর্ধদগ্ধ এ আগুনে। তবে টুটুলের কৃতিত্বে যে একেবারে স্বকীয়তা নেই তা নয়। অনন্তমাস্টার তাঁর আরও পাঁচটি ছাত্রকে ফরাসী বিপ্লবকাহিনী লিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেউ ঠিক টুটুলের মতো উগরে দিতে পারে নি। এমন থেমে থেমে, গলা নামিয়ে-চড়িয়ে, একটু থমকে গলা পরিষ্কার করে বলে যায় যেন গোটা ফরাসী বিপ্লবটাই তার নখদর্পণে শুধু নয়, সে কাহিনী প্রকাশের মাধ্যম যে বিদেশী ভাষা, সে ভাষাও তার বশংবদ ভৃত্য।

বলতে গেলে কী—টুটুলের এই জ্বলজ্বলে ছাত্রজীবনের প্রায় গোটাটাই এক চমৎকার পারদর্শিতায় বমি করার জীবন। বমির মালমশলা তৈরির জন্যে অবশ্য তাকে অনন্তমাস্টারের সহায়তায় খাটতে হয়, প্রত্যেক প্রশ্ন লিখে ফেলতে, প্রত্যেক পাটীগণিত—আর অ্যালজেবরার অঙ্ক, জ্যামিতির একসট্রা করে যেতে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। বুড়ীর কলেজের ইতিহাস ঘেঁটে ইতিহাসের প্রশ্ন তৈরি, তারপর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরীজ ইত্যাদির ইংরেজ কবিদের সম্পর্কে যে সমস্ত চটকদার ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তাও ফরাসী বিপ্লবের মতো আয়ত্ত করতে হয়। প্রায় সমস্ত ছাত্রজীবনটাই এই ফরাসী বিপ্লবের অভিনয় করতে করতে টুটুল ক্লাস নাইনের মাঝামাঝি এসে পৌঁছয়।

চেঙা কিন্তু ঠিক এ পন্থাটি আয়ত্ত করতে পারলে না। মুখস্থ করা তার একেবারে বরদাস্ত হত না। এমনকি জানা জিনিসও পরীক্ষার হলে গোলমাল করে ফেলত। অনন্ত-মাস্টার অনেক বকাবকি করলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে যেমন হাঁরের টুকরোয় রূপান্তরিত

করতে চলেছেন সেই হরিকখণ্ডের ধারকাছ দিয়েও চোঙা যাবে না বলে তাঁর দুঃখ হয়।

টেবিল-ল্যাম্পের আলোর সামনে সন্ধ্যে আটটাতেই ঝিমোতে থাকেন অনন্তমাস্টার। ভারী পুরু চশমার দরুন চোখজোড়ার স্বাভাবিক তেজ নষ্ট হওয়ায় কিঞ্চিৎ কোমল মনে হয়। তবে ইস্কুল করে আর পাঁচ-ছটা ট্যুইশানি ঠেলে তাঁর অবস্থা অবিকল পচিবাড়ির কাজে ক্লান্ত বাসনমাজার ঝির মতো যে আর পিঠটান করে বসতে পারেন না সন্ধ্যের পর। তবে অসাধারণ পাটজোয়ান শক্তিশালী চেহারা। বিশাল লম্বা চওড়া দেহখানা দুমড়ে বসে ঝিমোন। তাঁর একটিমাত্র ছেলে অমল, ম্যাট্রিকে দুবার ফেল করেছে। সারা বছর একবারও বসতে পারেন না ছেলেকে নিয়ে।

ঝিমোন কিন্তু খচখচ করে কলমের খোঁচায় ভ্রম সংশোধন করে যান। ইংরেজি কবিতার সামারি কলমের খোঁচায় একেবারে কণ্টকিত, দেখার পর খাতা সরিয়ে মৃদু আড়মোড়া দেন। অবসাদে ঔদাসীন্যে লম্বা কালো ঘামেভেজা মুখখানা পাথরের মতো দেখায়।

—এগুলো একবার লিখিয়েছিলাম না ?

চোঙা প্রথমে অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। তারপর বিরক্তিতে বলে ওঠে,—হ্যাঁ স্যার।

—কিছু হয় নি, আবার লিখো।

টুটুলের দিকে চেয়ে বলেন,—এক্সট্রাগুলো হয়েছে ?

টুটুল পরিপাটি করে খাতা সাজিয়ে রেখেছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে তার ভীষণ যত্ন।

—একটা পারি নি স্যার। টুটুলের গলায় চাপা দুঃখ। জ্যামিতিটা এখনও সে মুখস্থের ছকে ফেলতে পারছে না।

—কিছু ভেবো না, করে দিচ্ছি। কিন্তু দ্বিতীয়বার যেন ভুল না হয়।

—হ্যাঁ স্যার।

যতদিন যেতে থাকে ততই স্মরণশক্তির প্রখরতায় টুটুলের এ প্রত্যয় জাগে যে জ্যামিতি কেন, আশ্বিন এক মুখস্থের ছকে ফেলা যায়। পরীক্ষায় কোন গণিতের সম্পাদ্য প্রশ্নপত্রে দেখামাত্রই সে সম্পাদ্যের প্রতিরূপ, যা তার বাড়ির মোটাখাতায় করা আছে তা ভেসে ওঠে। এমনকি ভারতবর্ষের খনিজসম্পদের মানচিত্র, কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধে মনোভাব, মুহম্মদ তুঘলক কি পাগল না, প্রতিভাবান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋতুবর্ণনার ব্যাখ্যা—সমস্তই হাতের পাঁচ। আর হাতের পাঁচ হলে যা হয়, সারা মনটা খাঁ খাঁ করে।

দুভাই দুভাবে অবসরযাপন করে। সিনেমা, বাংলা-বোম্বাইয়ের চিত্রতারকাদের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী, তাদের প্রণয়বিবরণ ও কারুর কারুর কেবল মাছভাজা খেয়ে তব্বী থাকবার চেষ্টা, এরই মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, টেবিল টেনিস, পাশের বাড়ির ছেলে রমেনের সঙ্গে রেষারেষি যে পরবর্তীকালে বিখ্যাত এক বিলিতি কোম্পানির অন্যতম ডাইরেক্টর হয়ে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেছিল—এইসব নিয়ে চোঙার অবসর কাটে। তাছাড়া চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচেও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তার যাতায়াত বেড়ে যায়।

আর টুটুল তার মুখস্থ বিশ্ব থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে একলা একলা ঢাকুরিয়া লেক পাক দেয়। মাঝে মাঝে ফুটবল খেলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ নেই। লেকে সম্প্রতি আমেরিকান সৈন্যদের হাসপাতাল বসেছে। লাল ড্রেসিং-গাউন পরা লম্বা-চওড়া নিগ্রো সৈন্যগুলো তারকাঁটার বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বিষাদভরা চোখে সিগারেট টানে। তাদেরই আনকুলো কিছু বাঙালী তরুণ রাস্তার মোড়ে বক্সিং ক্লাব করেছে। টুটুল কদিন থেকেই লক্ষ্য করছিল। একদিন সোজা বক্সিং রিং-এ নেমে

যায়। তার আনাড়ি জোরাল হাতখানা যখন শূন্যে অসহায়ভাবে লক্ষ্য খোঁজে তখন ধীর স্থিরভাবে এক লিকলিকে বিপক্ষ তার নাকে গালে ঝাড় দেয়। টুটুল যত রাগে তত মার খায়। রিংমাস্টার খেলা থামিয়ে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দেয়।—গুড্, ভেরি গেপার্টিং! মুখ-চোখ লাল করে টুটুল ফেরে।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসে। বৃষ্টির পর জলে কাদায় বেরোনো দায়। তখনও দেখা যায় চোদ্দ বছরের এক কিশোর ঢাকুরিয়া লেক পাক দিচ্ছে। এক আধটা বিস্মিত বুড়ো মাঝে মাঝে তার সঙ্গী। আর তখন লেক এত শাড়ি গাড়ি রেফিউজি কোকো কোলার ভিড়ে সমাকীর্ণ ছিল না। পরবর্তী জীবনে লেকে বেড়াতে যাওয়া বলার সঙ্গে সঙ্গে যে কৌতুক-মিশ্রিত হাসি শ্রোতার মুখে লক্ষ্য করেছে সে কৌতুকের স্পর্শও পায় নি টুটুল। আসলে সে তার মুখস্থ বিশ্ব থেকে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করেছে।

একদিন খুব গরম। লেকের উল্টোদিকে আমবনে দুটো কামানের সামনে বসেছিল টুটুল। জলের ওপর ফাঁড়ঙের খেলা দেখছিল তন্ময়ভাবে। কখন একটা লোক তার বেঞ্চে পাশ ঘেঁষে বসেছে খেয়াল করেনি, লোকটা মাঝবয়সী, মাথায় টাক। কিন্তু মুখে এক ধরনের কাঁচুমাচু হাসি, এমন এক লেপ্টে থাকা ভিজে-ভিজে চাহনি যে সেদিকে চোখ পড়তেই টুটুলের মনে হল একটা টিকটিকি তার শিরদাঁড়া থেকে নেমে যাচ্ছে।

—কী দেখছো ? কী দেখছো ? বলতে না বলতে লোকটা খপ করে টুটুলের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। টুটুল আতঙ্কে দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপর দিগ্‌বিদিক ভুলে রোদ্দুরে দৌড়তে থাকে। লোকটা কে, কী চায়, স্পষ্ট বোঝে না। কিন্তু এরকম অযাচিত বন্ধুত্বের হ্যাংলামিতে যে প্রবল অস্বাস্থ্যের ছাপ ছিল তা তাকে পালাতে বলে। ব্রিজ পর্যন্ত সে ছোটে একলা একলা, তারপর মোড়ের কাছে একটা রিকশাওয়ালা দেখে থমকে দাঁড়ায়। এবার তার নিজের আতঙ্কে সে নিজেই লজ্জা পায়। আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে হাঁটে।

নাইন থেকে টেনে উঠতে টুটুলের জয়জয়কার। প্রাইজের দিন স্বর্ণপদক আর এক-রিকশাভর্তি বই নিয়ে সে যখন বাড়ি ফেরে তখন এ ঘটনাটা নিজের কাছে কোনো আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয় না। গাদাগাদা লিখে গাদাগাদা মুখস্থ করে সেগুলো যদি ঠিক-ঠিক জায়গায় বমি করে দেওয়া যায়—তাহলে গাদাগাদা নম্বর আসে, প্রাইজ আসে। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?

আশ্চর্য অবশ্য টুটুল শীঘ্রই হয়। তার প্রাইজের বইয়ের তাড়া থেকে তিনখণ্ড "গল্প-গুচ্ছ" তাকে এক আশ্চর্য, তার আদ্যোপান্ত মুখস্থ জগতের বাইরে ছিটকে দেয়। লেকের ধারে শীতের রোদ্দুরে ন্যাড়া কৃষ্ণচূড়ার নীচে রোদ পোয়াতে পোয়াতে সে পদ্মার তীরে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় এক আশ্চর্য সজীবতার মাঝখানে। অনেকগুলো লোকের মুখ আর অনেক রকমারি পরিবেশ একসঙ্গে তার মনের মাঝখানে ভিড় করে। এগুলোর মধ্যে যাবার জন্যেই যেন তার মন আঁকপাঁক করছিল এতদিন।

আর লেকে পাক দেওয়া আর রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছে"র জগতের সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা ব্যাপারও চাড়া দিয়ে উঠে তাকে একেবারে ওলোটপালট করে দিল। মেয়েদের শরীর সম্পর্কে একচোরা ছিঁচকে কৌতূহল তাকে গ্রাস করে ফেলে। এ কৌতূহল যে স্বাভাবিক ঘটনা, যা মেয়েদের ছেলেদের গায়ে-গায়ে গড়ে-ওঠার জগতে কোনো আত্মগ্লানির অবতারণা করে না—এ ধরনের চিন্তার সূত্রপাত করেদিতে কেউ সাহায্য করে না। ক্লাস টেনে যখন তার সারা গালে ব্রণ উজল দিল তখন বুড়ী তা নিয়ে মস্করা করল, এমনকি চোঙাও টিটকিরি

দিল। সবচেয়ে মজা করল জলপাইগুড়ির মনাদা।

মনাদা সত্যিই তার দাদার ভবিষ্যৎবাণী সফল করেছে। চাবাগান তদারক করার ব্যাপারে এখন সে বাপের প্রধান কর্ণধার। কলকাতায় এসে তার শিষ্য এবং যার মধ্যে ভারতীয় মহাজীবনের পুনরুদ্ভব হবে সেই টুটুলের চেহারা দেখে সে আঁতকে উঠল।—চল চল, বাবার কাছে-নিয়ে যাই। এসব কী করেছিস? বলে গড়িয়াহাটার কাছে স্বামী পরমানন্দের সামনে সেই বিমূঢ় অপরাধী কিশোরটিকে নিয়ে গেল। গেরুয়াকাপড়ে মোড়া বিশাল শরীর আর মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলওয়ালা লোকটা টুটুলের নাকের সামনে তাঁর বিশাল তর্জনীখানা তুলে বললেন,—এক-এক ফোঁটা বীর্য মানে ষাট ফোঁটা রক্ত। বুঝেছিস? কী বুঝলি? টুটুল মন্ত্রের মতো জপ করে,—এক-এক ফোঁটা বীর্য মানে ষাট ফোঁটা রক্ত। তার মনে হয় সে মরে গেছে; আর তার মৃতদেহের দিকে ঘরভর্তি লোক আঙুল দেখাচ্ছে।

—মনাদা! আতঙ্কে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে।

পরমানন্দ হাসলেন।—সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়াস নে। মানুষে জ্যোতির্ময়।

বয়ঃসন্ধির এই একলা বিপর্যস্ত পথহারা কাল কাটিয়ে উঠবার অনেকদিন পরও টুটুল এই পরমানন্দের কথাটা আঁচড়েছিল মনে মনে। কিন্তু তখন আঁচড়ানোই সার। সাহস ও আত্মবিশ্বাস আনতে সাহায্য করল না মোটেই। স্বপ্নে দিদির বন্ধু মমতাদি আসে প্রেয়সী হয়ে। ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লির পাতায় মেমসাহেবদের টাপরেটুপুরে বুক তাকে এক প্রকাণ্ড অস্থিরতার পথে ঠেলে দেয়। চোঙা এই সময়টা আড্ডা দেয়, ফুটবল খেলা দেখে, ডিটেকটিভ গল্প পড়ে। তার দাদার সঙ্গে তার দূরপথের দূরত্ব টুটুল ক্রমশ টের পেতে থাকে। কাউকে এই মেয়েছেলেদের কাল্পনিক তাড়নার কাহিনীটা যদি মন খুলে বলা যেত তাহলে বোধহয় মন শান্ত হত। কিন্তু সেরকম কোনো সুযোগ এল না। এ যেন মার খেতে খেতে মারের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা। চোঙাকে বললে, সে সবাইকে বলে বেড়াবে। বড়ো তো সুযোগ খুঁজছে মস্করা করার জন্যে। তাহলে কী করবে সে?

পঞ্জিকা আর খবরের কাগজে ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখে একবার ভাবলে তার যৌন অসুখ-টসুখ কিছু হয়েছে। তাছাড়া সে কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারে না তার এই অস্থিরতা, নিদ্রার ব্যাঘাত। মনাদাকে বলে সে রামকৃষ্ণের একটা ছোটো ফটো আনালে। ঘুমের আগে সেটা বুকে কপালে ঘষলে। কিন্তু তাতে কাজ বিশেষ হল না। তার অপরাধী-ভাব আরও বেড়ে গেল। টুটুল ক্রমশ সরে যেতে থাকে তার চারপাশের জগৎ থেকে। যেমনভাবে অপরাধী ফেরারী হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে ভাবে তার অনিশ্চয়তা থেকে পুলিশে ধরলেই ভাল ছিল, সেইভাবে সে ঘুরে বেড়ায় তার বাবা-মা-ভাই-বোন-মাস্টারমশাইদের চোখের ওপর দিয়ে। আর একমাত্র তার প্রায়শ্চিত্ত হয় স্কুলপাঠ্য মুখস্থের জগৎ। একমাত্র এখানে এসেই সে শান্তি পায়। সম্প্রতি স্কুলে তার আত্মবিশ্বাস এত বেড়ে গেছে যে আজকাল সে লাস্টবেঞ্চে বসে কতগুলো ধেড়ে ধেড়ে ফেলকরা ছেলেদের সঙ্গে।

বস্তুত প্রথম বেঞ্চির ছাত্রদের পরিচিত জগৎ থেকে তার শেষ বেঞ্চির তপনের সঙ্গে আলাপ করতে ভাল লাগে শিক্ষকদের প্রবল বিস্ময় সত্ত্বেও। কারণ প্রথম বেঞ্চির ছেলেরা সবসময় প্রশ্নপত্র আলোচনা করে; আর তপনের সঙ্গে সে আলাপ করে, কাননবালার-বয়স কত? সম্প্রতি তপনের সঙ্গে কাননবালার ছবি দেখে সে একেবারে অভিভূত। বোধহয় সাপ-টাপের ব্যাপার ছিল গল্পে। পুরুষের বেশে ডোরা শার্ট পরে যখন ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে কাননবালা তখন তার হাসি, গলার আওয়াজ এবং পরবর্তী সীনে গান টুটুলকে অনেক-

খানি সাবালক করে তোলে। তৃতীয়বার ছবিটা দেখার পর তপনের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব জমে। তপনের কোনো ব্যাপারেই লাজলজ্জা নেই, তার দৈহিক ব্যাপারের খুঁটিনাটি বর্ণনায়, এমনকি তার হস্তমৈথুনের প্রোগ্রামটা বলে ফেলায় টুটুলের বুকচাপা একাকিত্বের জগতের দরজাটা হঠাৎ আলগা হয়ে যায়। ঝোড়ো হাওয়ার দিনে রিক্সাতে ফিরিঙ্গি মহিলা দেখলেই সে কেমনভাবে টপ করে রাস্তায় বসে পড়ে তপনের এ ধরনের গল্পে এক মজা বোধ করে, যা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। তপন তাকে বললে, 'কাননবালার সঙ্গে তোর হবে না। তুই বড্ড ছোট। ভীষণ কাঁচা তুই।'

কিছুদিন পরেই বিয়াল্লিশের ঝড় ওঠে। ঝড় মানে পরবর্তীকালে সারা শহর জুড়ে যে বছরের পর বছর টালমাটাল চলেছিল তার তুলনায় খুব বড় ব্যাপার নয়। কলকাতায় কয়েক-বার গুলি চলে, কয়েকটা লোক মরে। আর খবরের কাগজের হেডলাইন এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। খবর আসে, গ্রামাঞ্চলে কোথাও রেললাইন উপড়ে তোলা হচ্ছে। গান্ধী-নেহেরুরা ইতিমধ্যেই জেলে গিয়েছেন। সর্বত্র পুলিশের তৎপরতা বাড়ে। কিন্তু টুটুল-চোঙার জীবনে তা বিশেষ ছাপ ফেলে নি। বড়ো হঠাৎ সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের এক দেশনেতার বাড়ি গিয়ে চরকা কাটতে আরম্ভ করে, পাড়ার আরও অনেকে তাতে যোগ দেয়। কিন্তু চরকা কাটার তাৎপর্য এইসব পরিবারের জীবনে বিশেষ প্রতিভাত হয় না। সেতার বাজানোর মতো, এম্‌ব্রয়ডারি শেখার মতো মেয়েরা চরকা কাটে।

যাঁরা বুকপকেটে ইতিহাস নিয়ে ঘোরেন তাঁদের কত সুবিধে! সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তাঁদের নখাগ্রে। তাঁরা অনায়াসে ইংরেজশাসনে ভারতবর্ষ সাদাকালোয় ভাগ করতে পারেন। সাদার ঘরে থাকবেন গান্ধী নেহেরু, কালোর ঘরে থাকবেন ভবনাথ। একদিকে ইংরেজ আর তাদের পুচ্ছ খয়ের-খাঁয়ের দল আর একদিকে দেশপ্রেমিক। কালের চেহারা যদি এত পরিষ্কার নির্দ্বন্দ্ব হত তাহলে কত ব্যাপারের কত হিল্লে হয়ে যেত! অর্থাৎ পরবর্তী কালে কংগ্রেস আমলেও এরকম মোটা সাদাকালোয় সমাজের চেহারাটা ধরা পড়ত এবং তারপরেও যে সমাজ আসছে সেখানেও এই ভোঁতা তুলির আঁচড়ে সমস্ত কালের চেহারাটা লেবড়ে লেপাপোঁছা করে দেওয়া যেত।

যেমন, উনিশশো বিয়াল্লিশের সাতই জুনে ভবনাথের মনের অবস্থাটা—আজ তাঁর রিটায়ারমেন্টের দিন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের প্রকোষ্ঠে ফাইলের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে তিনি কার্যত তাকিয়ে আছেন তাঁর গোটা তিরিশটা বছরের দিকে। ডিউক সাহেবের সঙ্গে ইস্টার্ভিউয়ের দিনটা অস্পষ্টভাবে মনে আসে। ট্রেনিঙের সময় প্রথম যেদিন ঘোড়ায় চড়লেন সেদিন থেঁড়েদুটোয় ছালবাকলা উঠে গেল। কম্পাউন্ডার মলম লাগাচ্ছে ক্ষতস্থানে এখনও স্পষ্ট দেখতে পান। আরও স্পষ্টতর পরবর্তী জীবন—হাওড়া, রংপুর, মৈমনসিং, ভোলা, নওগাঁ, রানাঘাট, মুন্সীগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। এলোমেলো হাওয়া আসে জানলা দিয়ে। অন্য-মনস্কভাবে সেদিকে চাইতেই নজরে পড়ে কাপড়ের ফালি-আঁটা জানলার শার্সি। মুহূর্তে বর্তমান কালটা তাঁর চোখের সামনে হাজির হয়। একবার বাবার চিঠির কথা মনে পড়ে: 'সার্ভিস ইন এনি ফর্ম ইজ সার্ভিচিউড অ্যান্ড কেনট বি এনিবডিজ অ্যাম্‌বিশান।' দারুণ লুফে নেওয়ার মতো কথা। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

—মেঘে মেঘে অনেক বেলা হল স্যার।। বড় বাবু ফাইল হাতে বললেন।

—আপনার আর ক বছর?

—আমারও স্যার হয়ে এসেছে। আর যা দিনকাল আসছে, চাকরিবাকরি করে সুখ নেই।

আপনারাই শেষ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান চালিয়ে গেলেন।

—তা কেন বলছেন ? আমরা চলে গেলেই রাজ্যশাসন চলে যাবে ?

গলা খাটো করে বড়বাবু বললেন,—তা না স্যার। তবে চারদিকে যেরকম অবস্থা। জাপানীদের কাছে কিরকম মার খাচ্ছে দেখছেন তো ?

এ কথাগুলো সম্প্রতি খুব আলোড়ন তুলেছে। ভবনাথ ভুরু কুঁচকালেন—যেরকম সরকারই হোক, শাসন চলবে। ঘরের মালিক পাল্টালে কি ঝাড়পোঁছ উঠে যাবে ?

—না স্যার, তা বলছি না। বলছি কি, বড়বাবু বাইরে করিডোরের দিকে চেয়ে আবার গলা খাটো করে বললেন,—এ জামানা বোধহয় থাকবে না।

—তাতে কী এল গেল ? আপনার ফাইল আনা বন্ধ হয়ে হয়ে যাবে ? এখানে যিনি আসবেন তিনি আর ফাইলে সই মারবেন না ? লোকজনদের সব ডানা গজাবে ?

বড়বাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—না না, আপনি স্যার ঠিকই বলছেন। চলে যাচ্ছেন, তাই মনের কথা একটু বলছিলাম।

বড়বাবু যাবার পর ভবনাথের মনটা ভার লাগে। আলোর দিকে ডান হাতের বাইসেপ-খানা ঘোরান ফেরান। এখনও অটুট তাঁর শারীরিক শক্তি। এখনও অনেকদিন চাকরি করতে পারেন। ভবনাথ উঠে পড়লেন। হাচিংস্ সাহেবের কাছে বিদায় নিতে হবে।

সেদিন চীফ সেক্রেটারি ভীষণ ব্যস্ত। জেলাশাসকদের কনফারেন্স সামনে। তবু ভবনাথকে কয়েক মিনিট সময় দিলেন। বললেন যে এক্সট্রিমিস্টদের আর-একবার রাউন্ড আপ করার কথা হচ্ছে। কুইট ইন্ডিয়া ব্যাপারটা যে একেবারে ব্যর্থ, কারণ তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়ায় নি—তাও বোঝালেন। তাঁর মতে, এগুলো ডিস্‌গ্রান্টল্ড লোকেদের কাজ। শেষে বললেন,—আই রিমেম্‌বার ভব। ইউ হ্যাভ্ বিন্ এ ফাইন অফিসার। আই শ্যাল গেট ইউ এ নেটিভ স্টেট ইন ওরিস্‌সা—সে, ইন সিক্স মান্থস টাইম। অল রাইট ?

যেসব ফাইলগুলো পড়ে ছিল সেগুলো দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কয়েকজন অফিসার আসেন বিদায় জানাতে। চাপরাসী, সাদা দাড়িওয়ালা ইয়াকুব, মস্ত সেলাম দেয়। বাইরে চোখে ঠুলিপরা ল্যাম্পপোস্টের নিচে আলোর বৃত্ত। সেই বৃত্তে মুহূর্তে থমকে দাঁড়ান ভবনাথ। ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্জন ডালহৌসী স্কোয়ারের লালবাড়িটার দিকে এক নজর তাকান। না, ভুল করেন নি চাকরি করে—এই কথাটা মনে আসতে না আসতেই অন্ধকারের ভেতর থেকে সাদা ট্রামটা দেখা দেয়।

অবসর গ্রহণের পরবর্তী বছরটায় নিজের মুঠি থেকে ভবনাথের নিয়মানুবর্তিত জীবনখানা আলগা হয়ে খসে পড়ে। না ঘরকা, না ঘাটকা—এরকম অবস্থায় দিন কাটে ক্রসওয়ার্ড পাজল করে, নব-র বাড়ি গিয়ে প্রতাপের কোন নতুন খবর এল কিনা এই সন্ধানে, সকাল সন্ধ্যে পার্ক ভ্রমণে।

পার্কের বুড়োদের বেঞ্চির দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত দমে যান। তারপর নবীন উৎ-সাহে চারপাক দিয়ে ফেলেন তরুণের দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে। তাঁর পাশের বাড়ির ভদ্রলোক তাঁদেরই সার্ভিসের লোক, বছর দুই হল অবসরপ্রাপ্ত। বোধহয় ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান ক্লাবের পান্ডা। বিরাট ব্রিজের মজলিস বসে সন্ধ্যেবেলা। মাঝে মাঝে সেখানেও যান ভবনাথ, কিন্তু আরাম পান না। ব্রিজ তিনি খেলতেন ভাল, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর কোন প্যাশান নেই যেমন তাঁর প্যাশান ছিল বাগান করার, চাকরি করার। এরই মধ্যে হঠাৎ প্রতাপের টেলিগ্রাম।

ইংল্যান্ডে সাড়ে আট বছর কাটিয়ে প্রতাপ যেদিন বম্বে মেলে হাওড়া স্টেশনে নামল সেদিন অনেক ভিড়ের মধ্যে ভবনাথের পরিবারের কতগুলো উৎসুক মুখও ছিল। প্রতাপ আই-সি-এস পাশ করতে পারে নি, চার্টার্ড আকাউন্টেনসি পরীক্ষার শেষ পরীক্ষাটাও দেয় নি। ভবনাথের চল্লিশ হাজার টাকার অপচয়ের প্রতিমূর্তি ক্লান্ত প্রতাপ যখন নামবার জন্যে ট্রেনের কামরার হ্যান্ডেল ধরে অপেক্ষা করছিল তখন স্বর্ণসুন্দরী নিজের মনেই বললেন,—ছেলে ছেলেই। অত ভাবতে হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভবনাথ এগিয়ে এসে তাঁর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের প্রতিমূর্তিকে জড়িয়ে ধরলেন।

ভবনাথের অবসর গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পরেই একটা বাংলা কাগজ হাতে করে চোঙা চেঁচাতে চেঁচাতে ঢোকে। —মা গুলি চলেছে ! গুলি চলেছে ! ট্রেনে আগুন লাগিয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই চলছে মা।

আগস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছে। ট্রেনের লাইন ওপড়ানো, গাড়ি জ্বালানোর খবর আসছে। বিডন স্ট্রীটে পুলিশের গুলিতে যে ছেলেটা মারা গেছে তার দাদা চোঙার কলেজের সহপাঠী। চোঙা কদিন থেকেই উত্তেজিত। মা-কে অবিরাম শাসাচ্ছে, সেও ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেবে। আর স্বর্ণসুন্দরী ভয় পান। ছেলেকে বোঝান, এখন কেবল পেনশানের ওপর সংসার। চোঙা ছাত্র আন্দোলন করলেই পেনশান বন্ধ হয়ে যাবে। তখন বাড়ি বেচে দিয়ে পাবনার বাড়িতে ফিরে আত্মীয়স্বজনের গুষ্টির মধ্যে জীবন কাটাতে হবে। চোঙার অবশ্য আতঙ্ক সৃষ্টি করা ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই। কাগজে যেরকম ছবি বেরোচ্ছে তাতে পুলিশের ঠেঙানি খাবার ইচ্ছে মোটেই তার নেই।

বাইরের জগৎটা টুটুলের কাছে আরও সুদূর। সম্প্রতি সে একটা বিশাল কবিতা লিখে উঠেছে। তার প্রাইজে-পাওয়া "গল্পগুচ্ছে"র প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা' থেকে নেওয়া। তার জীবনটা এখন ভাঙা-ইঁট-বের-করা পরিত্যক্ত নদীর ঘাট যা এককালে ছিল নারী-পুরুষ-শিশুর কলতানে মুখরিত। কবিতাটার নাম 'বিরহ', ভাব আর ভাষার দিক থেকে সবটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর নকল। কিন্তু চোদ্দ বছরের একটা ছেলের জীবনে এই অস্তিত্বের ক্রন্দন বয়স্ক লোকের চোখে যতই মেকি লাগুক, এই নকল-নবিশী কবিতাই এখন টুটুলের একমাত্র আত্মিক আশ্রয়। আসলে এখন হয়তো সে টেনিস ফুটবল খেলতে চায়, সাঁতরাতে চায়, পাহাড়ে উঠতে চায়, চায় দুকান ভরে সমুদ্রের গর্জন শুনতে, মিশবার জন্যে মন পড়ে থাকে সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে, বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু সেগুলো ঠিক হয়ে উঠছে না। বছরের পর বছর ধরে অধীত বিদ্যা উগরে আর কিছুদিন হল মেয়েদের শরীর সম্পর্কে আগ্রহে নাস্তানাবুদ হয়ে সে এখন চোদ্দ বছর বয়সেই বিরহী। তবে এই বিরহের কাহিনী সে গোপনে লালন করতে পারে না বেশি দিন। চোঙার আক্রমণে তেল্লাফেচাং হয়ে যায়। ইতিমধ্যে জাপান যুদ্ধঘোষণা করে।

দিনকয়েক পর একটা কিম্ভূতকিমাকার লোক অন্দরমহলে এসে ঢুকলে স্বর্ণসুন্দরী চমকে ওঠেন। নানারকম গুজব চলছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সরকারী বিজ্ঞাপন, 'গুজবে কান দেবেন না', কিন্তু সবাই ভেতরে ভেতরে আতঙ্কিত। গোপীনাথ পুঁইশাকের চচ্চড়ি-মাখা খুন্তিখানা শক্ত হাতে ধরে বেরিয়ে আসে।

—চিনতে পারছেন না ছোট মামীমা ? আমি ভুঁড়ি।

চীফ এ-আর-পি ওয়ার্ডেন, মাথায় স্টীলের হেলমেট, পায়ে বুট, খাকি উর্দির বুক-

পকেটে হাইসিল। এর সঙ্গে ভবনাথের কেরানী ভাগ্নের কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পান নি স্বর্ণসুন্দরী।

—আমাদের কাছে ডেফিনিট খবর। জাপানীরা ক্যালকাটা অ্যাটাক করছে। তবে বাইরে কথাটা একদম ছড়াবেন না। চারদিকে ফিফথ কলাম। বার্মাতে এসে গেছে, কলকাতায় আসতে আর কদিন? ভুঁড়ি এমন প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসে বলে যে ভবনাথও কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হলেন।

—বিশ্বেস হচ্ছে না ছোটমামা, না? ইংরেজদের গোলামি করেছেন সারাজীবন। নিউ আইডিয়া আসবে কোথা থেকে?

স্বর্ণসুন্দরী চটে উঠলেন,—নেমকহারামের মতো কথা বলিস নে ভুঁড়ি!

ভুঁড়িও গরম। বললে,—মামা-কাকারা থাকলে ওটুকু করবে না? আমিই তো পরশু তিনটে ছেলেকে চাকরি দিয়েছি আমাদের অফিসে। ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলেছে, তুমি যাকে সাজেস্ট করবে তাকেই চাকরি দেব।

উত্তেজনায় ক্ষমতার গর্বে স্টীল-হেলমেট-আঁকিতে এক রূপকথার নায়কের মতো লাগে ভুঁড়িকে। স্বর্ণসুন্দরীর ভয় হতে থাকে। হয়তো একটা পাইপ বার করে তাঁদের মুখের সামনে ধরাতে বসবে।

—এই টুটুল চোঙা, এদিকে আয়। তোদের জন্যে কী এনেছি দ্যাখ। তার পেছনে কুলির হাতে স্টিরাপ পাম্প, এক বস্তা বালি।

—শোন, বোমা পড়তে শুরু করলে একদম ঘাবড়াবি না। এয়ার রেড শেলটারে ঢুকে পড়বি। বাড়িতে পড়লে তক্ষুনি বালিতে করে বালি চাপা দিয়ে দিতে হবে। আর স্টিরাপ পাম্পে করে জল।

স্টিরাপ পাম্পটা পাওয়ায় দুভাই দারুণ উৎসাহিত বোধ করে। যেখানে সেখানে জল ছিটোতে থাকে।

ভবনাথ বললেন,—ভাল করে রেখে দে। গাছে জল দেওয়া যাবে।

ভুঁড়ি চটে উঠে বললে,—আমি কি ঠাট্টা করছি ছোটমামা? আমি ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি, আর সাতদিনের মধ্যে কলকাতায় বোমা পড়বে।

সাতদিন নয়, ভুঁড়ি বিদায় নেবার ঠিক সাতাশ দিন পর জাপানীরা বোমা ফেললে। হাতিবাগানে বোমা পড়ল। কয়েকটা লোকও মরল। কিন্তু সারা শহরে এমন প্রকাণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি হল যার তুলনা পরবর্তী কালে অনেক বড় বিপর্যয়ের সময়েও দেখা যায় নি। এর দু-তিন দিন পর থেকে হাওড়া স্টেশনের পথ লোকে লোকারণ্য। পশ্চিমী লোকেরা বিহার-যুক্তপ্রদেশের দিকে ছুটল। আর বাঙালীরা ছুটল দেশের বাড়ি, যাদের তা নেই তারা গেল ছোটনাগপুর; যাদের সে ব্যবস্থাও নেই তারা আশ্রয় নিল—চন্দননগর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, রানাঘাট, শ্যামনগর।

রাত দুটোয় একবার সাইরেন বাজল। বাইরে অন্ধকার নিষ্প্রদীপ, ঘরে আলো না জ্বালালেই ভাল। ভবনাথ উঠে দরজা ধাক্কাতে থাকেন। আতঙ্কে তাঁর ঘুসির জোর বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত জানা গেল সেটা দরজা নয়, আলমারি। সিঁড়ির নীচে গিয়ে যখন তারা ঢুকল তখন উত্তেজিত বড়ো ফিসফিস করে বললে,—আয়রে, আমরা সব পটাসিয়াম সাইনাড খাই। সম্প্রতি পটাসিয়াম সাইনাড খেয়ে এক ব্যর্থ প্রেমিকের দেহরক্ষার সংবাদ সে কাগজে পড়েছে।

ভবনাথের নীচতলা খালি হয়ে যায়। ব্যালকনিতে মস্ত বড় করে 'টুলেট' লেখা ঝোলে। খুব তাড়াতাড়ি রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপরিবর্তন ঘটতে থাকে ভবনাথের চোখের সামনে। ইংরেজ আছে, যেমনভাবে তাঁর নিজের হাত পা আছে—এরকম শারীরিক অনিবার্যতায় ইংরেজের উপস্থিতি তিনি আজীবন প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। কিন্তু দেশে বিদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিতে ফাটল ধরেছে। রোজ সকালে খবরের কাগজে বার্মা ফ্রন্টে ইংরেজের 'স্ট্রেটেজিক্যাল্ রিট্রিট' পড়তে পড়তে তাঁর এই আজীবন বিশ্বাসেও ফাটল ধরে। কলকাতা শহরের ওপর ইংরেজ আমেরিকান সৈনিকের কবজা যত চেপে বসে, ট্রাকের পর ট্রাক সৈন্য রাস্তা কাঁপিয়ে চলাফেরা করে, ততই ভবনাথ ভারতবর্ষে ইংরেজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। অবশ্য এ বিশ্বাস তাঁর এখনও আছে, হয়তো কোনক্রমে তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত ইংরেজ হয়তো তার সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস যে প্রায় মরিয়ার বিশ্বাস তা তিনি শান্ত মনে বিচার করলেই বোঝেন। আর এই নিষ্প্রদীপ খাঁ-খাঁ শহর থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে ভবনাথ ছটফট করেন। কিন্তু বারবার তাগাদা দিয়েও বিশেষ হিল্লে হয় না। শেষ পর্যন্ত সপরিবারে দেওঘরে চলে যান ভবনাথ।

একটা কাক উড়ছিল হাওড়াব্রিজের ওপর দিয়ে। স্ট্র্যান্ড রোডের ওপরে এসে উড়তে উড়তে কা-কা করে ডাকতে থাকে। নিস্তব্ধ খাঁ-খাঁ রাস্তায় সে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে বহুক্ষণ।

বনেবাদাড়ে ঘুরে কয়েক মাস পর লোকজন শহরে ফিরতে থাকে। তাদের কেউ কেউ অচিকিৎসায় মরে অচেনা জায়গায়। ভবনাথের পরিবার অবশ্য ভালই ছিল। ভবনাথের কালো চেহারা আয়রনের আধিক্যে ব্লোঞ্জকাঠিন্য অর্জন করে। স্বর্ণসুন্দরীর কিছুদিন হল শরীর ভাল যাচ্ছিল না, তাঁরও শরীর সারে। বুড়ীর চেহারা বরাবরই কালোর মধ্যে চোখে পড়ার মতো। এখন সে আরও চোখে পড়ছে। চোঙা আরও লম্বা হয়েছে। টুটুলের চেহারাও অনেক চাঙ্গা-চাঙ্গা লাগে। একথাতা ভর্তি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুকরণে সে পাহাড়পর্বত-বনজঙ্গলের কবিতা লিখেছে। আসলে সবগুলোই বিরহের কবিতা।

তেতাল্লিশ সাল পড়তে না পড়তেই কাগজে কাগজে মৃত্যুর সংবাদ বেরোতে থাকে। স্বর্ণসুন্দরী চন্দোসী আটার পুরনো একটা প্যাকেট হাতে করে গোপীনাথকে বললেন,—চার আনা করে আটার সের বলছে, তাও নাকি পাওয়া যাবে না। এই তো একমাস আগে কেনা ঠোঙা। কত পড়েছে বল তো গোপীনাথ?

—ও তো আড়াইসেরি ঠোঙা, পাঁচ আনা পারা! গোপীনাথ ডালে সমবার দিতে দিতে বললে।

ভুঁড়ি বাদ দিয়েও যেসব ভাইপো ভাগ্নে পাবনার বাড়ি থেকে কলকাতায় ছিটকে পড়েছে তাদের একজন এসে কলকাতা শহরের একটা অর্থনৈতিক বিপ্লবের বিবরণ দিলে। গত মাস পর্যন্ত সে মাসিক পনেরো টাকায় আমহার্স্ট স্ট্রীটের এক মেসে থাকত। পাঁচটাকা মেসিং চার্জ। দশটাকায় ভাতডালমাছের সঙ্গে দইয়ের ব্যবস্থা। এমাসে ম্যানেজার নোটিস দিয়েছে—যারা মাসে আটাশ টাকা দিতে পারবে তারাই বোর্ডার বলে গ্রাহ্য হবে। ভবনাথের এ ভাগ্নেটির সর্বসাকুল্যে মাসিক বিয়াল্লিশ টাকা রোজগার। ভাবছিল, দেশ থেকে সদ্যো-বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় সংসার পাতবে। কিন্তু জিনিসপত্রের যা দাম বাড়ছে তাতে আর চলবে না।

—ভুঁড়ির কাছে যাও। তার হাতে নাকি চাকরি আছে। ভবনাথ বললেন।

—তাই যাব। মেজদার সঙ্গে সাহেবদের খুব খাতির। এত খাতির কী করে হল বলতে পারেন?

বাস্তবিক নতুন সূর্যোদয়ের মতো ভুঁড়ি কলকাতার আকাশ রাঙা করে তুলেছে। লোকপ্রমুখাৎ ভবনাথ শুনলেন চালের কারবারে নেমেছে তার ভাগ্নে। এদিকে সে এ-আর-পি অফিসের কর্তা। কালের এই দ্রুতগতি ভবনাথ ঠিক বুঝতে পারছেন না, বিহ্বল বোধ করছেন। তাঁর এই বিহ্বলতা আরও বাড়ে ভুঁড়ির বিয়ে উপলক্ষে।

উত্তর কলকাতার এক চা-ব্যবসায়ীর শ্বিতভাঁয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করলে তাঁর ভাগ্নে। একেবারে জমজমাট পরিবেশ। ভবনাথের মনে মনে অহঙ্কার ছিল, পাবনাবাড়ির তিনিই সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কিন্তু ভুঁড়ির আলোয় তিনি ম্লান বোধ করেন। ভুঁড়ি অসম্ভব আদরযত্ন করলে বৌভাতের রাত্তিরে। একটা স্কুলবাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ভুঁড়ির সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বর্ণসুন্দরী ছেলেমেয়ে নিয়ে সে রাতটা বিয়েবাড়িতে কাটালেন। বাড়িতে করা চমৎকার লৌকিকেনির আধিক্য এত যে পরদিন প্রাতরাশ সেরেই বাড়ি ফেরার কথা ভাবলেন স্বর্ণসুন্দরী। ভবনাথ একটু অসন্তুষ্ট হলেন।

ভুঁড়ি বললে,—আমি মামীমাকে গাড়ি করে পাঠিয়ে দেব। অগত্যা ভবনাথ দক্ষিণমুখো ট্রামে উঠলেন।

বৌবাজার স্ট্রীটের ছানাপট্টির কাছে ট্রাম যত এগোয় তত একটা চাপা গন্ধ আসে। এই প্রথম মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলেন ভবনাথ শহরের রাস্তায়, একটা মিষ্টির দোকানের সামনে। হঠাৎ 'বাঁধো বাঁধো' বলে উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ভবনাথ নেমে পড়লেন ট্রাম থেকে। শেয়ালদার দিকে হাঁটতে গিয়ে পারলেন না। রাস্তার দুধারে ফুটপাত জুড়ে গলা কাদাটে পায়খানা। দুতিনটে মড়া টান-টান হয়ে পড়ে আছে। আশেপাশে কাক উড়ছে। অ্যাম্বুলেন্সের পাত্তা নেই। মিলিটারি ট্রাক হু হু করে চলে যাচ্ছে। 'আমরা কি সব মরে গেছি, আমরা কি সব মরে গেছি?' নিজের মনে বিড় বিড় করেন ভবনাথ। আর এগোতে পারেন না। জোরালো হোস্‌পাইপ দিয়ে ময়লা সাফ হচ্ছে। সেই জলের প্রবল ধারার সামনে দাঁড়িয়ে ভবনাথ আবার নিজেকে প্রশ্ন করেন, 'তাহলে কাগজে যা যা লিখছে তা সব ঠিক? এই অবস্থা?'

—আরও ভোরে এলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে বাবু, কর্পোরেশানের মজুরটি জলঝরা হোস্‌পাইপের মুখ নীচু করে বলে।

ভবনাথ অবসন্নভাবে বাড়ি ফেরেন। দক্ষিণ কলকাতায় যে অঞ্চলে তাঁদের বাস দুর্ভিক্ষের ঢেউ সে অঞ্চলে ঠিক এভাবে লাগে নি। একবার নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কেও আতঙ্ক বোধ করেন। এই সব গ্রামাঞ্চল থেকে কঙ্কালের মিছিল যারা কলকাতায় ফুটপাতে পড়ে মারা যাচ্ছে, লঙ্গরখানায় হঠাৎ খিচুড়ি পেটভর্তি করে খেয়ে কলেরায় মরছে তারা যদি সবাই বাড়িতে ঢুকে পড়ে, যা আছে ভাঁড়ারে সব চেটেপুটে খেয়ে নেয়। সে রাত্তিরে ভাল ঘুমোলেন না ভবনাথ। জয়নাল আবেদিনের সাদাকালোয় আঁকা একটা কাকের ছবি চোদ্দ টাঙিয়েছে তার পড়ার ঘরে। ভবনাথ স্বপ্নে দেখলেন সেই কাকটা ছবি থেকে বেরিয়ে সারা ঘরময় এঁটোকাটা ছড়াচ্ছে।

গত একমাস হল ভবনাথের বাড়ির নীচতলায় প্রায় একটা অফিস বসেছে। সেখানে

লিস্ট তৈরি করা হয়, লঙ্গরখানায় কে কতজন গেল, কোন্ কোন্ সমিতি থেকে চাঁদা এসেছে, তাছাড়া চালের লাইনে কিউ সামলাবার জন্যে কিংবা মারামারি ঠেকাবার জন্যে ভলান্টিয়ারের দল প্রতাপের কাছে আসে ডিউটি বুঝবার দরুন। সাদা কাগজে মোটা কালো আঁচড়ে মানুষের কঙ্কাল আর পাশে দাঁড়কাক এঁকে 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ছয়দফা সংকল্প' পোস্টার লাগানো থাকে। ভবনাথ বেকুব বনে যান প্রতাপের কাণ্ড দেখে। দু একবার বলতে গিয়েছিলেন—দেশে তো আরও লোক আছে, তাতে প্রতাপ ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল,—না নেই! সবাই দায়িত্ব এড়ালে চলবে না।

ভবনাথের একদিক বাঁচোয়া ইংরেজ-তাড়ানোর রাজনীতিতে প্রতাপ নেই। বস্তুত তার কাজে সরকারের সমর্থন আছে। আর এতে কিছু বলারও নেই। দেশে দুর্ভিক্ষ। জেলায় জেলায় সরকারী অফিসারদের এই রকম লঙ্গরখানা চালানো, চাল সরবরাহে যাতে আরও বিঘ্ন না বাড়ে তার ব্যবস্থা, এই ধরনের কাজই করতে হত। রাস্তায় রাস্তায় চামড়ায় জোড়া কঙ্কালের সারি, 'ফ্যান দাও মা' আর্ত চীৎকারে ভবনাথ আজকাল মুহ্যমান। যে সৌধ তাঁরা তৈরি করেছিলেন বছরের পর বছর তার নীচটা যে এত ফোঁপরা, যুদ্ধের এক চাপড়ে যে তা হুড়মুড় করে পড়ে যাবে, তা কখনও ভাবেন নি।

প্রতাপ আরও কয়েকমাস মেতে থাকে জনহিতকর কাজে। ভবনাথ একটু অবাকই হন। তার যে এদিকে এতখানি উৎসাহ ছিল খেয়াল নি। তবে আর-এক ব্যাপারে তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। অপরাধীর মতো প্রতাপের সাজানো তকতকে ঘরে এসে ঢোকেন।

—কদিন এরকম চলবে? ম্লান মুখে প্রায় আত্মজিজ্ঞাসা করেন ভবনাথ।

—যদ্দিন চালানো যায়, ভবনাথের দিকে পিঠ করে প্রতাপ দাড়ি কামাচ্ছিল, সেইভাবেই তার জবাব আসে। ভবনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিজেকে বড্ড ব্যর্থ লাগে। একবার তাঁর নিজের পিতা আর শ্বশুরমশাইয়ের কথা মনে আসে। স্ত্রী স্বর্ণসুন্দরীর মুখখানাও ভেসে আসে মনের মধ্যে।

—তুমি মনে করছো তোমার এতগুলো টাকা নষ্ট করলাম। সত্যিই শেয়ারে যদি খাটাতে তাহলে অ্যাদ্দিনে কত হত! লাখ দু-তিন টাকার মালিক হতে নিশ্চয়!

তারপর বাপের মুখোমুখি দাঁড়ায় প্রতাপ। ইতিমধ্যেই প্রতাপের মাথার সামনের দিকটায় বেশ টাক পড়েছে। আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছে। সেই রাজকুমারের চেহারাটা এখন সুদূর স্মৃতিমাত্র।

ভবনাথের দিকে চেয়ে হেসে বললে,—তুমি বাবা ঠিক তেমনি আছো। রানাঘাটে তোমাকে যেরকম দেখে গিয়েছিলাম তেমনি। আর তুমি ভাবছো পৃথিবীটা ঠিক তেমনি আছে।

ভবনাথ বুঝে উঠতে পারেন না কী বলবেন। সত্যি বলতে কি, ছেলে নিয়ে স্বপ্ন দেখা ছাড়া প্রতাপের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ নেই। তিনি ভেবে এসেছেন তাঁর জগতেরই সামান্য হেরফের হবে প্রতাপের জগৎ। কিন্তু তার কথাবার্তায় সেরকম মনে হয় না।

—আই. সি. এস-টা না হয়ে ভালই হয়েছে, জানো। সেই জেলায় জেলায় গিয়ে তোমার লাইফটাই রিপিট করা। বড্ড ভাল লাগতো। তাছাড়া, ইংরেজ চলে যাচ্ছে। তোমাদের জামানা একদম পাল্টে যাচ্ছে।

—তুই কী করবি ভাবছিস? এতক্ষণে পরিষ্কার করে বলতে পারেন ভবনাথ।

—তুমি আমাকে যতখানি অপদার্থ ভাবছো আমি ততখানি নই। আমি নববাবু হব না বলে দিচ্ছি। প্রতাপের ফর্সা লালচে মুখখানা খুব ভারিক্কি দেখায়। আস্তে আস্তে বলে,

—এত বছর ধৈর্য ধরে থাকলে, আর কটা দিন থাকো। মাকেও ধৈর্য ধরতে বলো।

ভবনাথ শ্রান্ত বোধ করেন। এতদিন সময়ের চেহারাটা সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। এখন সে ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। কালের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। তাঁর বাবা যেরকম চেয়েছিলেন তিনি সেরকম হন নি। তিনি যে স্বপ্নের জগৎ তৈরি করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে নিয়ে প্রতাপের জগৎ তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য ছেলেদের কথা ভাবতে পারছেন না। এত ছোট তারা, সময়ের দূরত্ব তাঁর এবং তাদের মাঝখানে এত দুস্তর যে তারা কোন্ দিকে যাবে সে চিন্তা তাঁর আওতার বাইরে।

প্রতাপ কোনদিনই সন্ধ্যের পর বাড়ি থাকে না। তার বিলেতফেরত বন্ধুদের মাঝখানে, এমনকি তার প্রাক্-বিলেত যুগের বন্ধুদের সঙ্গেও যাতায়াত করে। আর ততই নিজের কাছে নিজেকে অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন একলা লাগে প্রতাপের।

তিনটে বছর আই. সি. এস. মরীচিকার পেছনে ছোটা, তারপর অকৃতকার্য হয়ে তার আরও কিছু কিছু বন্ধুবান্ধবের মতো রজনী পাম দত্তের চেলা বনে যাওয়া, সেখানেও মন-স্থির করতে না পেরে ব্রিটিশ লেবার পার্টির আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ানো—এইভাবে হুড়-মুড়িয়ে নটা বছর কেটে গেল কী করে তা ভেবে মাঝে মাঝে নিজেরই অবাক লাগে প্রতাপের। আর যত পেছন দিকের উজ্জ্বল সন্ধ্যা, তারুণ্যের দীপ্ততে ঝলমল দিনগুলোর কথা মনে আসে ততই কলকাতার জীবন অসম্ভব নোংরা দীন লাগে।

এরকম মনের অবস্থায় সহপাঠী বিলেতবন্ধু ব্যারিস্টার দীপু সেনের বাড়ি হাজির হল প্রতাপ। বেশ ছিমছাম ফার্ন রোডে বাড়ি। ওপর থেকে গানের আওয়াজ আসছে, আর কুকুর ডাকছে।

কফি খেতে খেতে দীপু বললে,—তুমি মনস্থির করো প্রতাপ—পার্টি করবে না চাকরি করবে? তুমি তো জানো আমি নামকাওয়াস্তে ব্যারিস্টার।

প্রতাপ সেই ফ্যাকফেকে ফর্সা কর্মতৎপর লোকটিকে বললে,—তুমি ঠিক সেইরকম আছ দীপু। মনে হচ্ছে এই সেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইউনিয়ন করছ।

—পেছনের দিকে তাকিও না প্রতাপ। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

—বাবার সঙ্গে? কোথায়? প্রতাপ চমকে ওঠে।

—না না, বাড়িতে নয়। উনি বোধহয় বাজারে যাচ্ছিলেন। দেখলাম খুব ডিপ্রেসড্ তোমার সম্পর্কে।

—বাবা আমায় কী ভাবে আমি জানি না, প্রতাপ অসহিষ্ণুভাবে বললে।

দীপু হাতটা তুলে বললে,—ওরকম টাচি হয়ো না। বাবারা ওরকমই বলে। তুমি কি পার্টি করবে ভাবছো? তাহলে পার্টির ম্যাস ফ্রন্টে যোগ দাও। এরকম দুনৌকোয় পা দিয়ে কদ্দিন চলবে?

—ভুলে যেও না, আমি বাড়ির বড় ছেলে!

—সো হোয়াট! আমিও তো এক ছেলে। আসলে মনটা তোমার স্থির নেই। এরকম অবস্থায় তুমি চাকরিবাকরি করো। ওরকম মনের মধ্যে ভ্যাকুয়াম নিয়ে কোন কাজ হয় না।

দীপুর কাটা কাটা কথায় প্রতাপ আহত হয়। অথচ বুঝতে পারে তার যুক্তির অকাট্যতা। দীপু সেন বরাবরই পোলিটিকাল এলিমেন্ট। তার বিলেত-যাওয়াও এই রাজনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু সে নিজে কি কোনদিন ভেবেছে পার্টি করবে? বিলেতে যুদ্ধের সময় যে সাম্যবাদী ভাবধারার জোয়ার এসেছিল যা অনেককেই নতুন ঘাটে ভিড়িয়েছে, তা

প্রতাপকে ঢেউয়ের ধাক্কায় নাস্তানাবুদ করেছে মাত্র।

প্রতাপ তার সুন্দর মুখখানা কুঁচকেবলে,—বিলেতে জানো, পার্টির ব্যাপারটা অন্য-রকম। ও আবহাওয়ায় সবকিছুই করা চলে, সবকিছুই বলা চলে। কারণ তাতে তো কিছু এসে যায় না।

—এটা কী বলছ প্রতাপ? ওখানে নতুন চিন্তা সমস্ত এস্‌টাব্লিশমেন্টের গোড়া ধরে নাড়া দিচ্ছে।

—তাই কী? এটা তোমার মনগড়া কথা নয় দীপু? এইজন্যেই তো আমি পারলাম না শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে।

—দ্যাট্‌স রাইট। পার্টিতে থাকতে গেলে টেনাসিটি দরকার। শান্ত যান্ত্রিক গলায় দীপু বললে।

—তুমি কি ভাবো পার্টিটা তোমারই মনোপলি?

—অত চটে যেও না প্রতাপ।

—আমি জানি তোমরা আমাকে কী ভাবো।

—আমাদের অত ভাববার সময় নেই।

প্রতাপ উঠে পড়ে। দীপু বললে,—বোসো বোসো, তুমিও তো একদম পাল্টাও নি প্রতাপ। সেইরকম ইমপালসিভ আছ। আই শ্যাল টেল পিন্টু অ্যাবাউট ইউ।

—থ্যাঙ্কস, দরকার হবে না!

প্রতাপ গটগট করে বেরিয়ে যায়।

বাড়িতে ফিরেই হাঁক দেয়,—গোপীনাথ! গোপীনাথ!

গোপীনাথ এলে বলে,—দুটো স্যারিডন ট্যাবলেট নিয়ে এসো।

—স্যারিডন কী পারা?

—স্যারিডন কী এতদিনেও জানো না? একেবারে গেঁয়ো ভূত হয়ে আছ!

গোপীনাথ চটে যায়।—কী সব কথা বলিছ পারা! আমি পারিব না। লক্ষ্মণ বাজারে গেছে। সে আসুক।

—পারবে না মানে? রাগে থমথম করে প্রতাপের মুখ।

—ওসব আমি আনি না।

—তুমি তাহলে আছো কেন?

গোপীনাথ রাগে কোঁদে ফেলে।—তুমি আমাকে এরকম বলিলে প্রতাপ! কোলে পিঠে মানুষ করিলাম।

—কোলেপিঠে মানুষ করেছো বলে মাথা কিনে নিয়েছো!

এরপর যে পারিবারিক ঝড় ওঠে তার নজির নেই ভবনাথের পরিবারে। গোপীনাথ সেদিনই তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শুরু করে। স্বর্ণসুন্দরী শেষ চেষ্টা করলেন। প্রতাপকে গিয়ে বললেন মাপ চাইতে।—ও তোমার দাদার মতো প্রতাপ, স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

—কী সব সেন্টিমেন্টাল কথা বলো মা! তুমি তো নিজেই বলো, বাতে নড়তে পারে না গোপীনাথ। পুরনো লোক মানেই পারিবারিক বার্ডেন।

—আগের মতো জোর নেই। তাই বলে এইভাবে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? এর একটা বিহিত হবে না?

—একটা পেনশান দিয়ে দাও। পাঁচ-দশ টাকা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেই হবে

মাসে মাসে, প্রতাপ অনুত্তেজিত গলায় বললে।

অনেক অনুনয় করে গোপীনাথকে সে রাত্তিরটা ঠেকানো গেলেও পরদিন ব্যাপারখানা লেবড়ে থাকে সারা পরিবারের গায়। দোতলার বারান্দাটা যেন দুই শিবিরে বিভক্ত। একদিকে প্রতাপের শিবির, আর একদিকে গোটা পরিবারের শিবির। প্রতাপের গোঁ আরও বেড়ে যায়। ভবনাথের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলে,—বাড়ির বড় ছেলের কোন ভয়েস নেই। সে রাত্তির সে বাইরে খায়।

পরদিন পুরী এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে গোপীনাথ যখন জিনিসপত্র গুছোয় তখন টুটুলের মনে হতে থাকে, গোটা বাল্যকালটাই বিদায় নিচ্ছে। সম্প্রতি তার গালের দুপাশ দিয়ে হালকা দাড়ির এক আধটা ঝুরি নামতে শুরু করেছে। ছলছল চোখে টুটুল এসে দাঁড়াতেই গোপীনাথ তার বটুয়া বার করে। আর সেই বটুয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে টুটুলের মনে আসে রান্নাঘাটে রান্নাঘরের সিঁড়ি। জাঁতি বার করে সুপুরি কেটে দিচ্ছে গোপীনাথ। ঠিক সেইভাবেই কেটে সুপুরি দিতে দিতে বললে,—চোত্তা কলেজে? লাল কাপড় দিয়ে মোড়া মলাট আর সামনের কয়েকটা পাতাছেঁড়া কৃত্তিবাসের রামায়ণখানা টুটুলের হাতে তুলে দিয়ে গোপীনাথ বললে,—এটা রাখিয়া দাও। তুমি ভালবাসিতে।

গোপীনাথ যাবার দু-তিনদিন পরই প্রতাপ ফোন করে তার আর এক বিলেতবন্ধু পিন্টু ব্যানার্জিকে।

—পিন্টু? আমি প্রতাপ বলছি।

—গুড লর্ড! আওয়ার গ্রেট প্রতাপাদিত্য! তুমি এখন কোথায়? কী করছো?

—কী আর করব?.ঘাস খাচ্ছি। যে দেশে জন্মেছি সেখানে ও ছাড়া আর কী করব?

—বাট প্রতাপাদিত্য! আই সিরিয়াসলি মীন ইট, একদিন চলে এসো। শুনলাম বিলেত থেকে ফিরেছো কয়েকমাস। বনানী বলছিল তোমার কথা। আমরা কি এখনো এনিমি ক্যাম্পে?

—ওদিক থেকে হাসির আওয়াজ আসে,—তার মানে তুমিও গে'জে গেছো আমাদের মতো। ফাইন!

প্রতাপ আহত স্বরে বললে,—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—আমাকে কেন ধোঁকা দিচ্ছো ভাই? আমি খবর রাখি। ওই লণ্ডারখানা চালিয়ে বেশিদিন পার্টি করা যায় না। আমিও তো ছিলাম ভাই। আমি তো জানো—সব করেছি। "ক্যাপিটেল"-এ কেরানীর কাজ করেছি, তারপর কোরকমে হেঁচড়েমেচড়ে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স। ফি দেবার পয়সা থাকত না। তোমরা তো ভাই রাজা ছিলে। তুমি, দীপু সেন!

এতক্ষণে সামান্য ঝাঁঝের আভাস পায় প্রতাপ পিন্টুর গলায়। আকর্ষণও বোধ করে।

—আমি ভাবলাম, তুমি এখন ম্যান্ অব সাক্সেস। আমাদের ভুলে গেছো!

—নেভার! পিন্টু ব্যানার্জিকে কেউ কোনদিন তা বলতে পারবে না। তারপর চাপা উত্তেজনা মেশে তার গলায়,—মার্কসিজম ইজ নট এ ডগমা ব্রাদার। আমাদের দেশের এখন যা অবস্থা তাতে যদি ইন্ডাস্ট্রি কিছুটা বাড়ে, দু পাঁচটা ছেলে চাকরি পায়, তাহলেই আমি ভাবব, আই হ্যাভ ডান্ মাই বিট। তাছাড়া, কুড়ি বছর বয়সে, যে পার্টি করে নি আর তিরিশে যে পার্টি ছাড়ে নি, হি ইজ অ্যান ইডিয়েট।

শেষ কথাটা বেশ কয়েকবার শুনেছে প্রতাপ। তবে শোনা কথা নতুনত্ব হারালেও তার জীবনে সত্য।

—দীপুর কাছে গিয়েছিলাম। দীপু টেনাসিটির কথা বললে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পিন্টু বললে,—হি ইজ রাইট। সব ব্যাপারেই টেনাসিটি দরকার। আজ আমি কম্পানির নাম্বার টু। পাঁচ বছর আগে কোথায় ছিলাম?

রাসেল স্ট্রীটের এক সুইট নিয়ে থাকে পিন্টু ব্যানার্জি। ওপরে নীচে সর্বত্র সাহেব, কচিৎ কেউ পাঞ্জাবী। প্রতাপ বিস্মিত হয়। কাঠ মৈমনসিংহের বাঙাল রণজিৎ বা পিন্টু ব্যানার্জির মাত্র আট দশ বছরেই এই বৈপ্লবিক পরিণতিতে সে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে মুহূর্তের জন্যে বন্ধ দরজায় ঝকঝকে পিতলের নেমপ্লেটের সামনে।

সেদিন ছুটি ছিল। কফি খেতে খেতে পিন্টু অনেক কথা বললে তার কলেজের বন্ধুকে। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের এক গলা-আঁকড়ানো ভাব আছে। পিন্টুর মতে তা সমস্ত এনার্জি, সমস্ত ইনিশিয়েটিভ নষ্ট করে দেয়।

—যাকে মার্কস বলেছে ভেজিটেটিভ। ঐসব স্নেহ মমতা দরদ—দোজ আর অল পার্ট অব দ্যাট গেম। তোমাকে কিছু করতে দেবে না। ইট উইল কিল অল ইওর ইনিশিয়েটিভ। বিডন স্ট্রীটে আমাদের সেকেলে পুতুলওয়ালা বাড়িটায় তুই তো গিয়েছিস। আই ট্রায়েড মাই বেস্ট। পারলাম না থাকতে।.....সাউথ ক্যালকাটাতে বাড়ি বানাবার ইচ্ছে নেই। আই অ্যাম্ হ্যাপি।

প্রতাপের আত্মগ্লানি আসে। বছরের পর বছর ধরে পিন্টুর নিজের পায়ে দাঁড়াবার অবিশ্রান্ত চেষ্টার পেছনে যে প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা প্রতাপকে অভিভূত না করে পারে না। বলে,—আই ফুলহার্টেড এগ্রি পিন্টু। বাঙালী জীবনে কোন অ্যাডভেঞ্চার নেই।

—আমি ঠিক তা বলব না। অ্যাডভেঞ্চার তৈরি করতে হয়। লুক অ্যাট বনানী। শি ইজ এ গ্রেট ফাইটার। ইউ মাস্ট মিট হার।

বনানীকে অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে প্রতাপের। বলতে কি, বিলেত যাবার আগে সে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তার প্রতি আকৃষ্টও হয়েছিল, কৌতূহলী হয়ে সোজাসুজি তাকায় প্রতাপ পিন্টুর দিকে।

—তোমার যদি ওরকম একটা ইনভলভ্মেন্ট না হত, তাহলে আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতাম। শি কেম্ টু লানডান।

প্রতাপের ফর্সা কানদুটো লালচে দেখায়।—রমলা, ইউ নো, ওয়াজ জাস্ট সেক্স।

—না না, আমি তো কিছু ডিসঅ্যাপ্রুভ করছি না। তবে আমার মতে একটু বেশি-দিন ধরে তুমি গড়ালে।

প্রতাপ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে পিন্টুর দিকে। সত্যিই সে নিজে একটু বেশি-মাত্রায় লেবড়ে গিয়েছিল। এটা তার নিজেরই দোষ, রমলা কোনদিন তাকে বিয়ে করতে চায় নি। তার ফ্ল্যাটের দুখানা বাড়ির পরেই যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আর সেই গলির মুখেই যে 'বার,' সেই বারে কাজ করত রমলা। ভীষণ চ্যাংচঙে হাড়গিলে ঢেঙা মেয়েটি তার পুরু ঠোঁট দুটো ভাঁজ করে প্রথমদিনই এমনভাবে তাকিয়েছিল এই সুপুরুষ তরুণ ভারতীয়টির দিকে যে প্রতাপ একেবারে চিত। রমলার কোনো প্রত্যাশা ছিল না, এরকম মেয়েছেলে যে পৃথিবীতে আছে প্রতাপের সে সম্পর্কে ধারণা ছিল না আগে। বারের কাজ সেরে টিনের মাছ, রুটি আর কিনিয়াকের বোতল নিয়ে হাজির হত রমলা তার ফ্ল্যাটে শনিবার সন্ধ্যায়। তার সঙ্গে রাত্রিবাস এমনি এক শান্ত রুটিনের মতো প্রায় বছর দুয়েক চলেছিল। প্রতাপ তাকে তার ভারতীয় মেজাজ অনুযায়ী প্রথমেই প্রেমের কথা বলতে চেষ্টা করেছে, অমনি

রমলা একলাফে তার কোলে চড়ে গলা জড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে তার কথা স্তব্ধ করে দিয়েছে। যে শনিবার থেকে সে অন্তর্ধান হল তার আগে ঘুণাক্ষরেও প্রতাপকে তার ভাবী বিদায়ের কথা জানায় নি।

—কী ব্রাদার ? বড্ড চুপ করে গেলে যে ! আসলে কী জানো—সেক্সটা খুব ইম্-পর্ট্যান্ট মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তা নয়।

—কী ইমপর্ট্যান্ট ?

—ইমপর্ট্যান্ট হল মানি, পাওয়ার, স্ট্যাটাস। তুমি তো জানো না, টাকা না থাকা কী কার্স ! বিলেতে মনে হবে না। কারণ বিলেতে এত অপরচুনিটিস। কিন্তু এখানে এদেশে ...আচ্ছা ব্রাদার, তুমি লঙ্গরখানা চালাচ্ছো ?

প্রতাপ আবার আত্মগ্লানি বোধ করে। পিন্টুর এই কেরীয়ারের ইমারত গড়ার পাশে তার বিলেত থেকে ফিরে লঙ্গরখানা চালানো, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি বানানো, সবটাই শৌখীন লাগে।

—চাকরিবাকরি করার ইচ্ছে আছে ? হঠাৎ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় পিন্টু।

—চাকরি ? তা চাকরি না করলে......

—এ বয়সে আর স্বপ্ন দেখো না ব্রাদার। অনেক দিন তো দেখলে ! আর ফ্র্যাঙ্কলি, রিয়ালিটি অনেক বেটার স্বপ্নের চেয়ে। তোমার মামা নব না ? আই রিমেমবার এভরিথিং। আই মেট হিম্ ইন্ লান্ডান। তোমার খুব পসিবিলিটি আছে ঐরকম··ঐরকম রামখোকা বনে যাওয়া।

—আমি নব হতে চাই না।

—দ্যাটস্ রাইট। তবে কী হতে চাও ? তুমি কিছু ভাবো নি, কিছু ভাবো না, শুধু গড়াতে চাও। গড়িয়ে গড়িয়ে বছরগুলো পার করে দিতে চাও। এখনও সময় আছে প্রতাপ। বললে এখনও দেখতে পারি। পরে পারব না। আমাদের ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্টের পোস্টটা খালি আছে।

প্রতাপের সামনে কয়েকটা বছর সিনেমার পর্দায় দ্রুত ফ্ল্যাশব্যাকের মতো খেলে যায়। তার আই. সি. এস পরীক্ষায় ব্যর্থতা, পার্টির আনাচেকানাচে ঘোরাফেরা, রমলা, বারে বসে কাগজ পড়া আর আড্ডা, শেষের দুবছরের দুর্বিষহ অবস্থার কথা স্পষ্ট মনে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ভবনাথ আজকাল চটি ঘষতে ঘষতে অপরাধীর মতো যেভাবে তাঁর ঘরে ঢোকেন সেই আওয়াজটাও কানে বাজতে থাকে।

—অলরাইট পিন্টু, আই অ্যাক্সেপ্ট, দীর্ঘশ্বাসের উচ্ছ্বাসে বলে ফেলে প্রতাপ।

—দ্যাটস রাইট। মিট মি অ্যাট ক্যালকাটা ক্লাব, স্যাটার্ডে ইভনিং।

চোঙা আজকাল লেক ক্লাবে রোইং করছে। অনেকখানি লম্বা হয়েছে। চটপটে চতুর এই ছোকরাটি তাদের কলেজের ছাত্র এবং 'ফাদার'-দের বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছে। তার পাশে টুটুলকে বয়সে বড় দেখায়। তার শান্ত লাজুক স্বভাবের জন্যে কিছু পরিমাণ অসামাজিকও লাগে। দুই ভাইয়ের মানসিকতা ক্রমশ আলাদা হতে শুরু করেছে। একথাটা তাদের বাবা-মায়ের চোখে বিশেষ ধরা পড়ে না। কিন্তু এ কথা পরিষ্কার, দুই ভাই তাদের মেজাজ অনুযায়ী দুই নদীতে তাদের নৌকো ভাসাতে চলেছে।

ইতিমধ্যে একদিন চোঙা টুটুল আর পাড়ার কজন যারা মাঝে মাঝে লেকের ধারে

একসঙ্গে বেড়াতে যেত দল বেঁধে এবং তাদের মধ্যে চোঙার কোনো কোনো বন্ধু হাল্কের হিন্দি গান গেয়ে উঠত, 'মেরা বুলবুল সো রাহা হ্যায়', তাদের মধ্যে এক বিপজ্জনক বাজি হয়ে যায়।

আজকাল লেকের চারপাশে আমেরিকান সৈন্যতে সমাচ্ছন্ন। এরই মাঝে সন্ধের পর নার্সদের কোয়ার্টারের আশেপাশে তরুণ আমেরিকানগুলো মাছির মতো ভনভন করে ঘুরতো। এমনকি চোঙার কোনো কোনো বন্ধুর প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ওপরেই আরও কিছু গর্হিত কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। ছেলেদের মধ্যে পাঁচটাকার বাজি হয়। যে সন্ধের অন্ধকারে বাড়িটার গেটের গায়ে হলুদ দেয়ালে ইংরেজিতে 'ব্রথেল' কথাটি লিখে আসতে পারবে তাকে পাঁচটাকার রসগোল্লা খাওয়ানো হবে।

সন্ধের অন্ধকারে সাদার্ন অ্যাভিনিউ আর ল্যান্সডাউনের মোড়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পাঁচটি তরুণ অপেক্ষা করে। ঘন ঘন মিলিটারি ট্রাক যায়। বসন্তের হাওয়ায় পেট্রলের গন্ধ। খানিক-দূরেই তাদের বেড়ার পেছনে লাল পশমের ড্রেসিং গাউন পরা নিগ্রো সৈনিকদের সারি। অন্ধকারে সিগারেটের আগুন দেখা যায়। সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে যত তারা দক্ষিণ দিকে এগোয় বুকের ধকধকানি বেড়ে যায় টুটুলের। এক-একবার বিরক্ত হয়। পরীক্ষা এসে গেছে। এখন ক্রমাগত মুখস্থ অধীত বিদ্যার পুকুরটা সাঁতরে তোলপাড় করার সময়। এখন চোঙার ফাঁদে পড়ে এই বিপদের মুখে যাওয়ার কোনো মানে হয় !

নার্স কোয়ার্টার থেকে গানের বাজনা ভেসে আসছে। গীটারের সঙ্গে পুরুষালী মহিলাকণ্ঠ ভেসে আসে :

প্লীস থিঙ্ক অব মি
থিঙ্ক অব মি ওনলি
হোয়েন ইউ আর লোনলি,
প্লীস্ থিঙ্ক অব মি।

এবারে কতগুলো সৈনিক তাদের পাশ দিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়। লটারিতে টুটুলের নাম আগে ওঠে। তার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে যায়। সে বোধহয় আজ ধরা পড়ে যাবে, রানাঘাটে পটকা চুরি করতে গিয়ে যেমন পড়েছিল। প্রত্যেকের হাতেই ছোট চক। এবার টুটুল এগোয়। গেটের পাশে হলুদ দেয়াল দেখা যায়। টুটুল হঠাৎ থেমে পড়ে। সমস্ত ব্যাপারটা তার হাস্যকর ছেলেমানুষি লাগে। পেছন দিকে ফিরে চকটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

—ভেড়ো ! চাপা গলায় চোঙা বললে। তারপর আরও তিনটি উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে বললে,—আমি যাচ্ছি, তোরা দ্যাখ।

সামনে এগিয়ে গিয়ে সিগারেট ধরায় চোঙা। তারপর গটগট করে চলে কোনদিকে না তাকিয়ে। এমনভাবে হাঁটে যেন সে হলুদ দেয়ালটা দেখতেই পায় না, দেখতেই পায় না তার সাত হাত দূরে দাঁড়ানো নিজেদের মধ্যে আলাপে মগ্ন চার পাঁচটি আমেরিকান সৈন্যদের দলটিকে। ব্রথেলের শেষ অক্ষর 'এল' লিখবার সময় হাত সামান্য কাঁপে কারণ তার মনে হল একজন সৈনিক তাকে লক্ষ করছে। অক্ষরটা লিখবার পরই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আধখাওয়া সিগারেট অন্ধকারে ছুঁড়ে দেয়। পেছনে না ফিরে সামনে মিলিয়ে যায় চোঙা।

পরদিন সকালে হৈ হৈ। মিলিটারি পুলিশ স্থানীয় থানাপুলিশ সমেত জীপ নিয়ে স্থানীয় অঞ্চল জুড়ে ঘোরাফেরা করে, কয়েকজন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। পুলিশ

চাকরি রক্ষার্থে কয়েকজন পুরনো গাঁটকাটা গ্রেপ্তার করে।

চোঙা বললে তার রসগোল্লা ভাল লাগে না। সবাই মিলে চাঙোয়া রেস্তোরাঁতে গিয়ে চিংড়ির কাটলেট দিয়ে ফীস্ট হয়। সে রাত্তিরের ঘটনায় তারুণ্যের অনেকখানি আত্মবিশ্বাস অর্জন করে চোঙা।

আর চোঙা-টুটুলের চোখে না পড়লেও ভবনাথ টের পান কলকাতা পাল্টাচ্ছে। জাপানীদের হাতে মার খেতে খেতে যেমন ইংরেজ সাম্রাজ্য টলমল করছে তেমনি ইংরেজের তৈরি এই আধখানা গ্রাম আধখানা শহর কলকাতা টাল খাচ্ছে। অবসর জীবনে ট্রামবাসে ঘোরাফেরা তাঁর বেড়েছে সম্প্রতি। আর তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না ট্রামে বাসে ভিড় বাড়ছে, দোকানের সামনে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের আশায় লম্বা লম্বা খদ্দেরের কিউ, সিনেমা হলের টিকিট কাউন্টারের সামনে লোকের সারি, ফুটপাতে ভিখিরি হকার আর চেঁচামেচি। আঁক-পাঁক করেন ভবনাথ। চারপাশের পরিবর্তন, তাঁর পারিবারিক জীবনের পরিবর্তন তাঁকে প্রত্যহ হকচকিয়ে দেয়। তিনি যেন পেনশানের পর এই অপেক্ষমান দুটি বছরের দারুণ গ্রীষ্মে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ট্রামস্টপে, কপালের ঘাম মুছছেন আর রোদ্দুরের রুপোলি ধোঁয়ায় চেয়ে আছেন বহুদূরে যেখানে সামনের দুইসারি বাড়ি শেষ হয়েছে এক অনির্দিষ্ট বিন্দুতে। এরই মধ্যে হঠাৎ ট্রামের আবির্ভাব। ছত্তিশগড় স্টেটসের পলিটিকাল এজেন্ট মিচেল সাহেবের টেলিগ্রাম। সোনপুর স্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছেন ভবনাথ। পরদিন সকালে রিক্সায় চেপে স্বর্ণসুন্দরী 'কালীঘাটে' গেলেন পুজো দিতে।

সম্প্রতি টুটুলের রেসাল্ট বেরিয়েছে ম্যাট্রিকের। চারটে বিষয়ে লেটার পেয়েছে, সরকারি জলপানি, স্কুল থেকে স্বর্ণপদক। স্বর্ণসুন্দরীর মনে হল অনেকদিন পর তাঁদের পরিবারের মরাগাঙে চাঁদের আলো পড়ল। পাড়া ঘুরে ঘুরে ছেলের কৃতিত্বের কথা, স্বামীর নতুন চাকরির কথা বলে বেড়াল। গোপীনাথের অভাব বড্ড বোধ করেন, তবে দমেন না। নতুন হিন্দুস্থানী চাকরকে তাঁর অসম্ভব হিন্দিতে উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্যের অসম্ভব বর্ণনা দেন। বড় ছেলের সঙ্গে সম্প্রতি তাঁর খ্যাঁচ হয়েছে। প্রতাপ স্মিথ অ্যান্ড প্যাটারসনে ভালো চাকরি পেয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে পার্ক সার্কাসে ফ্ল্যাট নিয়েছে। কিন্তু তবু 'প্রাণাধিকেষু প্রতাপ' বলে পারিবারিক সুসংবাদ দিয়ে চিঠি দিলেন। আমেরিকাতে রামপট লিখলেন গৌরীকে। বড়মেয়ে-জামাইকে নেমন্তন্ন করলেন।

সোনপুরে দেওয়ান কোয়ার্টারের গা দিয়ে মহানদী বয়ে গেছে।—আর চাল ? এখানকার মতো ? একটুও কাঁকর নেই ! কিন্তু মা-র এসব কথায় চোঙা বিশেষ উৎসাহিত হল না।

—বাইরে বনবাদাড়ে আর ভাল লাগে না মা, কলকাতা ছেড়ে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

বাইরে বারান্দায় মুন্সীগঞ্জের জেলখানায় তৈরি সতরঞ্চি পেড়ে টুটুল গ্রামোফোন বাজাচ্ছিল।

—তুই তো কবি মানুষ, তোর তো খুব ভালো লাগবে সোনপুর ! স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

টুটুল উৎসাহিত হয়ে বললে,—এই রেকর্ডটা শোনো মা, কী মজার :

এ আর পি মিলিটারি,
পথে পথে ভিখিরি,
ক্যালকাটা নাইনটিন ফর্টিথ্রি, অক্টোবর।

সোনপুরে আবার বেগুন খেত বানালেন ভবনাথ। বসন্ত নামে কুচকুচে কালো সাড়ে

ছ ফিট লম্বা এক ছোকরা তাঁর দেখাশোনা করত। সে আর তার স্ত্রী সরো। সরো স্বামীর অর্ধেক কিন্তু কোঁদা পেটা গড়ন, উড়িষ্যার পেতলের রাধামূর্তি যেন। বসন্ত কুয়ো থেকে জল তুলে বাগানে দেয়, নেংটি পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে এ গ্রাম সে গ্রাম করে, কিন্তু তার চোখদুটি অসম্ভব কোমল মায়াবী, গলার স্বরও সুরেলা। সন্ধের পর যখন বাংলোর আশেপাশে আমকাঁঠালের জঙ্গলের শুকনো ঝরাপাতায় চাঁদের আলো পড়ে তখন সাহেবের ভাত চড়িয়ে বাঁশিতে ফুঁ দেয়। কোনো একটা গোটা রাগ বা গান কিছু বাজায় না, বোধহয় শিখছে, খালি ফুঁ দেয়। আর কোনো একটানা সুরসৃষ্টির জন্যে নয়, চারপাশের বিশাল নৈস্তব্ধ্যের মধ্যে ছাড়া-ছাড়া আড়বাঁশির ফুঁয়ে বন্য এক করুণ আর্তনাদের মতো আওয়াজ বাতাসে ঘোরে। বর্ষায় সারা বছরের শুকনো মহানদী চেনা যায় না। বিশাল চওড়া বালির ওপর সারা বছর যে সব উঁচুনীচু পাথরের চাঁই রোদ্দুরে ঝলকায়, অন্ধকারে জন্তুর মতো শুয়ে থাকে, সেগুলো ডুবে যায়। জল পাক খায়, আছড়ায় পাথরে, কান পাতলেই গুমগুম আওয়াজ শোনা যায়।

সোনপুরে এসে ভবনাথের মনে হয় তিনি আবার তাঁর প্রাক্তন জীবনে ফিরে গেছেন। বিকেলে বেগুনখেতে বেড়াতে বেড়াতে রানাঘাটের বাগানটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কলকাতায় এমন অবস্থা হয়েছিল শেষপর্যন্ত চাকরিটা না হলে মুশকিলই হত। প্রতাপ বনানীকে দুম করে বিয়ে করল, তাতে অবশ্য তিনি খুশিই হয়েছিলেন। কারণ বনানীকে তাঁর ভালো লেগেছিল। বেশ গুছোনো মেয়ে, নিজে একটা স্কুল চালায়। যে কাজ করে, দায়িত্ব নেয় তাকে ভবনাথ সব সময় মনে মনে তারিফ করেন। কিন্তু এরকম অন্তহীন দাম্পত্য-কলহ তিনি আগে গল্পেও পড়েন নি। স্বর্ণসুন্দরীর উপায় ছিল না, কখনও বউয়ের পক্ষে, কখনও ছেলের পক্ষে যান। আরও ঘোঁট পাকে। তারপর নাটকীয়ভাবে প্রতাপের গৃহত্যাগ, পার্কসার্কাসে ফ্ল্যাটগ্রহণ। সমস্তটাই বড্ড এলোমেলো, কোন পারম্পর্য নেই। স্বর্ণসুন্দরী অনেক চেষ্টা করেছিলেন। প্রতাপ-বনানীকে নিয়ে আসেন সোনপুরে। প্রচুর মুর্গী কাটা হয়। খাওয়াদাওয়া হৈহল্লায় বেশ কেটে যায় কয়েকটা দিন। কিন্তু কলকাতায় ফিরে স্বর্ণসুন্দরীর চিঠিতে ভবনাথ জানতে পারেন, দাম্পত্যকলহ বেড়ে গেছে। স্বর্ণসুন্দরীর সামনে একদিন দুজনে চটি ছোঁড়াছুঁড়ি করে বিবাদনিষ্পত্তি করলে।

টুটুলের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর দুঃসহ গরমে স্বর্ণসুন্দরী এলেন সোনপুরে। তখন মহানদী শুকনো। প্রায় মাইলখানেক চওড়া বালি রোদ্দুরে ঝলকাচ্ছে। এখানে এসে টুটুলের প্যাশান হল নদীতে দুবেলা স্নান। চোঙাও এসেছিল। কিন্তু এই ফ্যানহীন দুর্জয় গরম আর অপরিসীম নির্জনতা এত বোরিং লাগছিল তার কাছে যে দিন দশেকের মাথায় সে পালাল। স্বর্ণসুন্দরীর ইচ্ছে ছিল আর কদিন থেকে যাবেন। কিন্তু চোঙা বুড়ী দুজনেই অনিচ্ছুক। দুজনেরই গ্রামাঞ্চল ভীষণ বোরিং লাগে। বুড়ী সাফ বললে,—ওসব গ্রামট্রাম ভালো লাগে না মা। কোন কমপানি নেই। অদূরে পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ারের একটি ফুটফুটে মেয়ের কথা বলায় বুড়ী বললে,—একেবারে গেঁয়ো মা, তাছাড়া কী কথা বলব ? সকাল সন্ধে উল বুনছে।

চারদেয়ালে চারটে বড় আয়না সাবেকি ক্লোকরুম। টুটুল সেখানে ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করে। আস্তে আস্তে তার পেশীগুলো চেহারা নেয়। আয়নায় সেই চিকন কোমল ঘর্মাক্ত ঘাড় ও বাহু, উরুতে সিল্কের মতো নবোদ্গত লোম—সেদিকে চেয়ে টুটুলের নিজেকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। দুখণ্ড বার্নার্ড শ সঙ্গে এনেছিল। ঘুঘুডাকা দুপুরে

শুয়ে সরো বসন্ত অবাক সেদিকে তাকায় আউট হাউস থেকে। সন্ধের পর চান। সঙ্গে বসন্ত, কোন কোন দিন সরোও সঙ্গে থাকে। গরমে জল শুকোলেও তিরিশ চল্লিশ হাত টুলটলে জল এখনও আটুট। মাঝে মাঝে পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে। বুড়ীকে বসন্ত প্রায় কাঁধে করে এপার ওপার করাত। সাঁতার সে একদম ভুলে গেছে। ছ'টির দিনে ভবনাথ যান। এখনও পেশীতে আশ্চর্য জোর। একদিন জলে বুড়ী আর চোঙা জড়াজড়ি করে ডুবতে বসেছিল, বসন্ত ছিল না ধারেকাছে। শেষ পর্যন্ত ভবনাথ সাঁতরে এসে চোঙার চুল ধরে টেনে তুললেন।

এ অঞ্চলের হাওয়া এত শুকনো যে সন্ধের পর জলে নেমে বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই চুল খটখটে শুকনো। একটা হাঁচিও পায় না। চান করে চাঁদনিমাখানো পাথরের ওপর পা দিয়ে পাড়ে উঠে আমকাঁঠালের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে টুটুল যখন বাড়ি ফেরে তখন অপারসীম সম্ভাবনায় সামনের জীবনটা দুলতে থাকে।

এরই মধ্যে টুটুল এক সন্ধেবেলা সাঁতরাচ্ছে। পেছনে খানিকটা দূরে সরো। সরো মাছের মতো সাঁতরায়। বসন্ত একটু দেরিতে আসবে ভাত গেলে। সামনে জলে ভেজা কালো পাথর। দুজনেই একসঙ্গে পাথরটা ধরে। ছোটো পাথর। টুটুল উঠে পড়ে জিরোয়। সরো জিরোয় না। সে পেছন ফিরেই সাঁ সাঁ করে সাঁতরে চলে। টুটুল হঠাৎ কোনো দিকে না চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জলে নামে। জলের পেছনে পেছনে সাঁতরায়। তারপর আধ-কোমর জলে এসে দুজনে দাঁড়তেই টুটুল হাঁফাতে হাঁফাতে সরোকে জাপটে ধরে। সরো কোন কথা বলে না। আস্তে আস্তে শক্ত হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে তীরে উঠে কাপড় সামলে নেয়। তারপর পিচ করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বালিতে থুতু ফেলে। সটান পেছনে ফিরে হনহন করে এগিয়ে যায়। টুটুল হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। মহানন্দীর ধারে তার কৈশোরের স্বপ্নরাজ্য খান খান হয়ে ভেঙে যেতে থাকে। পরের দুটো দিন সে আর স্নানে যায় না। সেই যেরকম আতঙ্ক হয়েছিল পটকা চুরি করে ঠিক সেই পর্যায়ে না হলেও ভবনাথের কানে কথাটা ছড়াতে পারে ভেবে মুষড়ে থাকে। দুদিন বার্নার্ড শ পড়াও বন্ধ ছিল। কিন্তু দেখা গেল সে রকম কিছুই ঘটল না। বসন্ত কিংবা সরোর হাবভাবে কোন পরিবর্তন এল না। দুজনেই তাকে ডেকে আবার চানে নিয়ে গেল। খালি বসন্ত একটু বেশি কাছে থাকত টুটুলের।

সরো দুপুর বাড়িটা চুল্লীর মতো তেতে থাকে। সন্ধেবেলা বাড়ির সামনে খাটিয়া পড়ে। তবে রাত বারোটা পর্যন্ত বাতাস বন্ধ। ভবনাথ খাটিয়াতে এপাশ ওপাশ করেন। মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি শোনা যায়, 'উঃ, বার্নিং সেনসেশান!' টুটুলও এপাশ ওপাশ করে। ভোরের দিকে হাওয়া ছাড়ে। আর খুব ভোরে লাল নীল সবুজ শাড়ি পরে তেলেঙ্গা মহিলারা আসে আম নিয়ে। টাকায় একশো।

তিনমাস গরমে কাটিয়ে কলকাতায় ফেরে ঝকমকে আঠারো বছরের টুটুল। চোঙা তার গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—একদম কবির মতো লাগছে তোকে। সেইরকম বোকা-বোকা।

চোঙা সন্ধের পর লেক রোইং ক্লাবে যায়। তার এক ভক্তের দল জুটেছে। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে চৌরঙ্গীর দিকে পাড়ি দেয়। তার এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বন্ধুর বোন লুসি তাকে চুমু খেতে চেয়েছিল কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করেছে ইত্যাদি গল্প করে টুটুলের সঙ্গে।

—চল, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। তুই তো মেয়ে দেখলেই মূর্ছা যাস।

—না না, আমার দরকার নেই, টুটুল একটু ভয়ে ভয়ে বলে।

—তুই যেরকম ভাবছিস তা নয়। ওরা অনেক ফ্রি। আমাদের বাঙালী মেয়েরা প্রুডিশ।

চোঙা আজকাল মেয়েদের সম্পর্কে খোঁজখবর রাখে। ভাইকে বলে,—দ্যাখ, তোকে আমি টিপস দিচ্ছি। কখনো ভিজে-ভিজে প্রেম করবি না। বেশ শুকনো খটখটে প্রেম, ন্যো রিগ্রেট। হাসিমুখে এসো, হাসিমুখে যাও। সোজা কথা বাবা, লেবড়ে যেও না। টুটুলকে তার বন্ধু-বান্ধবের প্রেমের কাহিনীও অনেকগুলো বলে।—সুজিতটা এমন পাঠা, ভাস্বতীর সঙ্গে একেবারে লেবড়ে গেছে। ভাস্বতীর বাবা মা, সুজিতের বাবা মা, সব মিলে মিশে যা ঘোঁট পাকিয়েছে একেবারে এ-ওয়ান। রতনকে তো তুই চিনিস, রতন মাইরি গ্র্যান্ড। রতন দীপা মালকানির সঙ্গে প্রেম করলে, এখন রুমা বাসুর সঙ্গে আছে। মনটা একটু ছড়া, বুঝেছিস।

মহিলাজগৎ সম্পর্কে চোঙার এই প্রবল মানসিক উদ্দীপনা টুটুলের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। বছরখানেক আগে মেয়েদের সম্পর্কে দৈহিক কৌতূহলে সে নিজে বেশ আবিষ্ট ছিল। এখন অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে তার দাদার মানসিক উদ্দীপনা তার নেই। তবে গল্প শুনতে ভাল লাগে। মানুষ যেমন জঙ্গলের পাহাড়ের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী শোনে টুটুল তেমনি শোনে মেয়েদের গল্প।

চোঙা এখন অনেকটা লম্বা। গায়ের রং আগের চেয়ে চিকচিকে। তার ওপর পাতলা মুখে সতেজ সরু গোঁফের রেখায় তার বেশ বিজ্ঞাপনের মতো চেহারা। সেই মোটর সাইকেল কিংবা সিগারেটের বিজ্ঞাপনে যেরকম ড্যাশিং ইয়াংম্যানদের দেখা যায় চোঙা যেন সেই দলের। ভবনাথকে আজকাল কর্তা বলে চোঙা। বললে,—কর্তা ভাবছে, আমি সেন্ট্রাল সার্ভিস দেব। একটা চিঠিও লিখেছে।

—ভালই তো।

—তুই কিছু জানিস না। ইউ আর এ চাইল্ড। অনুরাধাপুর কোথায়? দাঙ্গা হলে কীভাবে তুমি থামাবে?—এসব ভেবে আমার স্বারা হবে না। আমার ভীষণ বোরিং লাগে সমস্ত ব্যাপারটা। তাছাড়া ঠিক বাবার মতোই আবার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরব ভাবতেই গায়ে জ্বর আসে।

—তাহলে কী করবি? বিলেত যাবি?

—নাঃ! আর দাদার মতো বাবার ঘাড়ে চড়তে ইচ্ছে করছে না। কর্তাও বুড়ো হয়েছে, এখন টানতে পারবে না। অথচ কী জানিস! ফ্র্যাঙ্কলি, বিলেত না গেলে কিছু হবেও না।

টুটুল অসহিষ্ণুভাবে বললে,—এতগুলো লোক দেশে নেই? সবাই বিলেত যাচ্ছে?

—ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল টুটুল। তুই একেবারে টিপিকাল বাঙালী, জানিস। একেবারে নিজের ভাবে ডুবে আছিস। দেশে তো সবাই আছে। কিন্তু যারা—মানে কাউন্ট করে—সবাই বিলেতফেরত। তুই দ্যাখ—গান্ধী, নেহরু, সুভাষ বোস, রবীন্দ্রনাথ, আমাদের রতনও যাচ্ছে। এই যে দাদার চাকরিটা হয়ে গেল, কেন বলতে পারিস? বিলেতের ফ্রেটার্নিটি। যারা ইংরেজ তাড়াও তাড়াও করছে তারাও সব বিলেতফেরতা। একটু থেমে পা নাচাতে নাচাতে চোঙা বললে,—বিলেতফেরতারা আসলে একটা ক্লাস যারা দেশ চালাচ্ছে, চালাবে।

—তুই তাহলে কী করবি ছোড়দা?

—কী করব ? জানি না। আপাতত বি. এস-সি, এম. এস-সি।

—তুই ছোড়দা কলেজে পড়া না।

চোঙা নাটকীয়ভাবে ভুরু তুলে বললে,—কলেজে ? হরার ! পাঁচ বছর মাস্টারি করলে জানিস তো কী হয় ?

—তোদের কলেজে ছাত্রনেতারা আসে ছোড়দা ? টুটুল ফস করে জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ আসে। অনেক কথা বলে। সাম্যবাদ, প্রগতি, স্বাধীনতা। কয়েকজন বেশ ব্রিলিয়ান্ট। দারুণ ইংরেজি বলে। আমি এক কান দিয়ে শুনি, আর এক কান দিয়ে বের করে দি।

টুটুল অবাক হয়ে বলে,—তার মানে ?

—তাছাড়া কী করবি ? পুলিশের সঙ্গে লড়াই করবি ? মাথা ফাটাবি ? একেবারে মারা পড়বি, টুটুল। ওর মধ্যে যাস না, একেবারে মারা পড়বি।...আর তুই তো ভাল রেসাল্ট করছিস। তুই ওসবের মধ্যে যাবি কেন ? যাদের কিছু হল না তারা ঝান্ডা ধরে।

—কিন্তু ওরা যা বলে.....তাতে অবশ্য কিছু বাড়াবাড়ি আছে.....

—নেই বল ?

—হ্যাঁ তা আছে, কিন্তু আবার সত্যিও কিছুটা আছে।

—তুই কি ভাবছিস সবাই এরকম থাকবে ? আমি হলফ করে বলতে পারি, আজ যে সব ছাত্ররা ঝান্ডা উঁচিয়ে চেঁচামেচি করছে, নেতাগিরি করছে, পাঁচ-সাত বছর পর তারাই মার্কেন্টাইল ফার্মে বস হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

টুটুল বললে, —সেটা তুমি এত জোর করে বলতে পার না।

—তুই আইডিয়ালিস্ট। আমি জানি তুই আমার কথা মানবি না। কিন্তু যত বয়স হবে দেখবি শুধু আইডিয়ালিজমে জীবন চলে না।

চোঙা আবার পা নাচায়। বলে,—তোর সম্পর্কে আমার ভয় আছে টুটুল। সাহিত্য-ফাহিত্য করিস, কবিতা লিখিস। অনেক জিনিস একদম বুঝিস না। আমার ভয়, তোর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে লোকে খাবে। যারা থার্ড ক্লাস লোক তারা চড়ে বসবে তোর মাথায়।

টুটুল নতুন চোখে দেখে চোঙাকে। তার যুক্তি সে মানে না কিন্তু চোঙা যে এত কাছের লোক হয়েও প্রায় এক বিপরীত জগতের বাসিন্দে হতে চলেছে তার আভাস পেয়ে টুটুল অবাক হয়।

—তুই ভাবছিস আমাদের সামনের জীবনটা সেই রানাঘাটের মাঠ, কিংবা মুন্সীগঞ্জের ইন্দ্রাকপুর ফোর্ট। একেবারেই না, একেবারে না!

টুটুল অবাক হয়ে ভাবে এত জোর দিয়ে শেষ কথা বলতে শিখল চোঙা কোথা থেকে ?

আঠারো উনিশ বছরে অনেক তরুণেরই পায়ের নীচে সমস্ত পৃথিবী, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৃথিবী পরাজিত। এই বয়সটা টুটুলের জীবনে এল উল্টোভাবে, তার সমস্ত অন্তর্জগৎ চুরমার করে দিয়ে। ভাল ছাত্রের মুখস্থ জগৎ ওলোটপালট করে তার নিজেকে নিয়ে ক্রমাগত তন্ময়তার মুখে বিরাশিসিক্কার জন্বালাধরা থাপ্পড় মেরে আঠারো-উনিশ হাজির হল।

খুব ভোরে পার্কে বেড়ানোর অভ্যাস টুটুলের। এই ভোরটাই তার কবিতার জগৎ, তার বাল্যকালের জগৎ, দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার জগৎ। সেই একঘেয়ে একটানা সকাল-

সন্ধেবেলা ক্রমাগত মুখস্থ করার পৃথিবী থেকে এ আর এক পৃথিবী। টুটুল সেদিনও পার্কে ঢুকছিল কিন্তু একটু অবাক হয়ে দেখে অন্যদিনের চেয়ে অসম্ভব ফাঁকা পার্ক। এরকম সময় অন্তত দশ-বারো জন বৃদ্ধ বেড়ান, তিন-চারটে লোক কুকুর নিয়ে ঘোরে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকেরা মিলিটারি কায়দায় ড্রিল করে আর কিছু বয়স্ক অফিস-কর্মী ভুঁড়ি কমাবার জন্যে টেনিসবল পেটে, আনাড়ি ব্যাটে বল ওঠে অনেক উঁচুতে। পার্কে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হয় একেবারে ফাঁকা পার্ক। এমনকি আশ্চর্যের কথা, পার্কের পাশের গলিও ফাঁকা। শূন্য দুটো ট্রাম শিষ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ পার্কের কেন্দ্রস্থল যেখানে ফুটবল সেন্টার করা হয় সেদিকে স্বপ্নাবিষ্টের মতো টুটুল এগোয়। দূর থেকে একটা সবুজ লুঙ্গি দেখা যাচ্ছিল। কাছে আসতে লাসটা দেখা যায়। লোকটা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে আছে মাথার ওপর আকাশের দিকে। একটা ফড়িং উড়ছে তার মুখের ওপর। অনেক বছর পরও ঘুরে ফিরে টুটুলের এ ছবিটা মনে পড়েছে। সেই অবাক মৃত লোকটি আর সে নিজে—এই তার প্রথম যৌবনের ছবি।

তারপর পার্ক থেকে বেরিয়ে যে দৃশ্য তার চোখে পড়েছে তা সে মনে করে রাখতে চায় নি। তা সে জোর করে পরবর্তী জীবনে মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছে। কারণ দুঃখটা জ্যাবড়া হলে তার আর কোনো চেহারা থাকে না। তা সমস্ত মানবজীবনের দুঃখের সঙ্গেই একাকার হয়ে থাকে। স্মৃতির ওপর তার কোনো আলাদা দাবি থাকে না। রাস্তার ঠিক মোড়ে সাতটা লাস পরপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সাজানোর মধ্যেও কারুকার্য আছে। লোক জমছে একটু একটু করে। স্বপ্নাবিষ্টের মতো টুটুলও সেদিকে পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু কাছে আসতেই প্রবল বমির দমকে সে আচ্ছন্ন হয়। টলতে টলতে বাড়ি আসে। বাড়িতে ঢুকতেই চোঙার চীৎকার কানে এল। পার্ক সার্কাসে সমস্ত হিন্দু ওয়াইপ্ড আউট।

তারপর স্বাধীনতা, ১৯৪৭। স্বাধীনতার আগের সন্ধে, লেক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিল টুটুল। একটা রেডিওর দোকানের সামনে ভিড়। র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের ঘোষণা। সামনেই বোধহয় মুর্শিদাবাদের এক মাঝবয়সী বাসিন্দা। প্রকাণ্ড মোটা, ধুতি শার্ট ফুঁড়ে সামনের দিকে ঠেলে উঠেছে ভুঁড়ি। ভারতবর্ষের মধ্যে মুর্শিদাবাদ ঘোষণা হতেই, লাফ মেরে বললেন, মারদিস ! মারদিস ! তারপর বিমর্ষ এক যশোরবাসীর সামনে হাত নাচিয়ে নাচিয়ে গাইলেন, 'যশোর থেকে নতুন গাঁজা আমদানি করেছি।' সে ভদ্রলোক আধখাওয়া সিগারেট শুনো ছুঁড়ে বললেন,—দূর ! বোগাস।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭-এর হুল্লোড়ে কলকাতাবাসীর মধ্যে টুটুল-চোঙাও ছিল। চোঙা তার কলেজের বন্ধুদের নিয়ে আজাদহিন্দ বাগে কাবাব খেতে। আর রাস্তায় রাস্তায় ট্রামে-বাসে পাড়ার লোকদের ট্রাকে ঘুরল টুটুল। চিৎপুরে গোলাপজলের ধারায় সিক্ত হল। তারপর হিন্দু মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গে নাখোদা মসজিদের অলিন্দেও ঘুরল খানিকক্ষণ। তারপর আর কী করবে বুঝতে না পেরে উল্লসিত জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার প্রথম সিগারেট ধরালে।

গত দুবছর একটা কাণ্ড ঘটে গেল। টুটুলের সেই "খেয়া", "ক্ষণিকা", "বলাকার" জগৎ, তার "গল্পগুচ্ছের" জগৎটাও একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেল। এই কলকাতা আর তার চারপাশের জীবন, এই উত্তেজনা অবসাদ আশাভঙ্গ—এগুলো তার প্রথম যৌবন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল। সে টের পায় চোঙা থেকে সে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। চোঙা এই সমস্ত ঘটনার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে কিন্তু সে বাঁধা পড়ে গেছে, আর বর্তমানের এই প্রবল দৃঢ় বন্ধনে সে

এক নতুন আনন্দ পায়। তার কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে যায়। চোঙার কথাটা বারবার মনে আসে, 'ভিজে প্রেম করবি না, খটখটে শুকনো প্রেম।' কিন্তু টুটুল চারপাশের প্রেমে ভিজে যায়। বুঝতে পারে না সে কোথায় চলেছে। তার পুরনো কবিতার জগৎ থেকে, তার মুখস্থ বইগুলো থেকে সে বেরিয়ে আসছে। এক-একবার ভয় হয়। তার চেনাজানা জগৎটায় যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু দেখে দরজায় তালা ঝুলছে।

আশ্চর্য খারাপ করল টুটুল পরীক্ষায়। প্রথম শ্রেণীর জন্যে যে ছিল অবধারিত সে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা মাঝের পাদানি কোনরকমে আঁকড়ে ধরল। পরিবারের সবাই আশ্চর্য হলেন, স্বর্ণসুন্দরী কাঁদলেন। চারপাশের হাহাকারে অসহ্য হয়ে টুটুল এল সোনপুরে এক প্রবল অস্থিরতা নিয়ে। দুবছর আগের সেই স্বপ্নরাজ্যটাকে খুঁজেপেতে আবিষ্কার করতে চায় টুটুল। তেমনি সাঁতারে যায়, ব্যায়াম করে, সাহিত্যের বই পড়ে। কিন্তু অনেকখানি যান্ত্রিক লাগে এই জীবনচর্চা নিজের কাছে। এও আর একটা মুখস্থকরা জীবন। টুটুলের কাছে এ জীবন বিস্বাদ লাগতে শুরু করে।

—দুঃখ করিস না। সেন্ট্রাল সার্ভিসে অ্যাপিয়ার হ। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভবনাথ সান্ত্বনা দেন। পরীক্ষার কাগজপত্তর আনবার জন্যে লিখতে বলেন।

এরই মধ্যে একদিন মুখ গম্ভীর করে ফেরেন ভবনাথ। ভেবেছিলেন কন্ট্রাক্ট রিনিউড হবে আরো দুবছরের জন্যে, কিন্তু তা হয় নি। ভবনাথ এবার তাঁর চাকরির জগৎ থেকে সত্যি বিদায় নিচ্ছেন। আর সাহেবরা চলে গেছে। নইলে হয়তো আরও কিছুদিন চালাতে পারতেন।

ট্রাকে জিনিসপত্তর উঠছে। বসন্ত সরো আরো দু-তিনজন কুলির সঙ্গে জিনিস তোলে। ভবনাথ টুটুল গাড়িতে উঠলে বসন্ত আর সরো তাদের লাজুক-লাজুক মুখে গাড়ির পাশে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। টুটুল একবার উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে বসন্তের মাথা ছাড়িয়ে মহানন্দার সীমারেখার দিকে চেয়ে থাকে।

সেদিন বসন্ত-সরোর খুব ভাল ফাঁস্ট হয়। বাগানে ফলন্ত বেগুন, একটা ছোট কুমড়োও পেড়ে আনে সরো মাচা থেকে। অন্ধকারে ভাত ফোটে। আগুনের তাতে লালচে দেখায় সরোর মুখ। আর বসন্ত তার আড় বাঁশিটায় ফুঁ দেয়। কোনো একটানা সুর নয়, ছাড়া-ছাড়া একটা বন্য ভারী বিলাপ ফাঁকা বাংলোয় ঘোরে।

[ক্রমশ]

বিজ্ঞান পরিকল্পনার ভূমিকা

মিহির সিংহ

বাস্তিগত বা অপেক্ষাকৃত-সংকীর্ণ-গোষ্ঠীনির্ভর প্রয়াসের পরিবর্তে সচেতন সামগ্রিক কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টায় সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর রেওয়াজ রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন নয়। উদাহরণ-স্বরূপ আরক্ষা- ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থায়, দু-চারজন খাপছাড়া বা চিন্তাবিপ্লবী মানুষ ব্যতীত অন্য সকলের দৃষ্টিতে, কেন্দ্রগত পরিকল্পনা আর পরিচালনার কোনো বিকল্পই নেই। গণ-তান্ত্রিক বন্দোবস্তে জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারেন মূল পরিকল্পনাটিকে। কিন্তু, রচিত-আলোচিত-গৃহীত হবার পরে, তাকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নিতান্তই কেন্দ্রগত। বস্তুত, পরিকল্পনাপ্রণয়নও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব। রচনা আর রূপায়ণে কোনো ত্রুটি হলে, তার সমালোচনা জনসাধারণের এক্তিয়ারে থাকলেও, সেই আলো-চনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও কেন্দ্রের-ই।

আরক্ষা বা প্রতিরক্ষা বা তুলনীয় বিষয়ে নিয়োজিত লোক, অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারাই বিন্যস্ত এবং নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এবং, অংশত, বৈজ্ঞানিক- তথা প্রযুক্তি-সংক্রান্ত অগ্রগতির ফলে আর তজ্জনিত ক্রমবর্ধমান জটিলতার দরুন, এ-সম্বন্ধে যথার্থ আলোচনাও বিশেষজ্ঞদের একচেটিয়া হয়ে পড়ে; অ-বিশেষজ্ঞ জনসাধারণের হাতে না আসে তথা, না থাকে ঘটমান অবস্থার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝবার ক্ষমতা। রাষ্ট্রীয় গোপনতা কোনো কোনো সময়ে অহেতুক হলেও, বহু সময়ে অপরিহার্য। সুতরাং বৃহৎ আর আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে, আরক্ষা বা প্রতিরক্ষা বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন বিষয়গুলি ক্রমশই চলে যেতে থাকে কেন্দ্রীয় চিন্তার নিভৃত অন্তরালে; ক্ষেত্রবিশেষে, প্রকাশিত এবং প্রকৃত তথ্যাবলির মধ্যেও ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে ওঠে।—গণতান্ত্রিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে এই বিশেষ প্রবণতাটি আরো প্রকট।

অথচ, মূলত, আরক্ষা বা প্রতিরক্ষা বা তুলনীয় অন্যান্য বিশাল যন্ত্রগুলির উদ্ভব ও সার্থকতা সম্পূর্ণ ব্যবহারিক, এবং ঐ অ-জ্ঞান জনসাধারণের স্বার্থেই যে তাদের চরম বিচার—তা বারংবার পুনরুক্ত হতেই থাকে নেতৃস্থানীয়দের কণ্ঠে। ফলে, একটি দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ঘটে : যাদের স্বার্থ সাধিত হবার কথা, তাদেরই বিশেষ সুযোগ থাকছে না স্বার্থসাধনের উপায়টিকে যাচাই করবার। যারা এই সামগ্রিকস্বার্থসাধনপ্রয়াসে কর্মী হিসেবে অংশগ্রহণ-কারী, তাদেরই অবস্থা অনুরূপ। এমনকি, এ ধরনের উদ্যোগের একটি কোনো অধ্যায় সম্পূর্ণ হলেও, সাধারণ স্বার্থ কতটা সাধিত হল বা আদৌ সাধিত হল কিনা, তারও সমাক বিচার সাধারণ মানুষের স্তরে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এর স্থূল দৃষ্টান্ত—একটি যুদ্ধ। যুদ্ধটি যখন চলছে তখন না হয় এক কথা। যখন সমাপ্ত হল, তখন-ও সাধারণের পক্ষে এ-বিচার অতি দুরূহ যে যুদ্ধটির ফলে তাদের মোটের উপর লাভ হল কিনা—যদিও যুদ্ধে ব্যয়িত সম্পদ তাদেরই থেকে আহৃত, যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতিও প্রত্যক্ষভাবেই তাদের। পুরাকালে এ-স্বন্দ্ব ছিল না। কারণ তত্ত্বগতভাবেই কর্মের ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রক ছিলেন রাজা। বর্তমানেও এ-স্বন্দ্ব আপাতত নিরর্থক সেইসব সমাজে যে-সমাজ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত। উন্মুক্ত বলে যে-সমাজগুলি পরিচিত, সেখানে অবাধে—এমনকি অবোধ (!)—আলোচনার রেওয়াজ থাকলেও,

অর্থপূর্ণ আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ তথ্যাবলি কিন্তু কেন্দ্রগত এবং বাস্তবিক দায়িত্ব এবং ক্ষমতাও তাই।

এই মূলগত দ্বন্দ্ব, ভালো হোক মন্দ হোক, গণতান্ত্রিক সব দেশেই অল্প-বিস্তর থাকবে। এবং তার (সাময়িক হলেও) যথার্থ নিরসন হতে পারে তখনই, যখন পরিকল্পনা অথবা অনুসৃত কার্যক্রমের এমন বিরাট কোনো ব্যর্থতা দেখা দেবে, যার ফলে উচ্চতম নেতৃত্বে বা বিশেষ শ্রেণীতে ক্রান্তিসূচক পরিবর্তন সংঘটিত হবে। প্রসঙ্গত, এর অল্প-বিস্তর পরেই কিন্তু সেই পুরাতন দ্বন্দ্বের পুনরাবির্ভাব ঘটবে; নবোত্থিত নেতৃত্ব বা নূতন গৃহীত কর্ম-পদ্ধতি যে জনস্বার্থসাধনে ক্ষমতাচ্যুত নেতৃত্ব বা বাতিল-হয়ে-যাওয়া কর্মপদ্ধতির চাইতে অধিকতর আশাব্যঞ্জক—তাও তো বিতর্কিত বা প্রমাণসাপেক্ষ। অর্থাৎ, স্বল্পস্থায়ী তরল অবস্থার অব্যবহিত পরেই দেখা যাবে পরিচালনব্যবস্থার সুকঠিন কেন্দ্রীভবন। স্বল্পকালীন বিকেন্দ্রিত অবস্থা সাধারণতই সিংহাসনে আরোহণ-অবরোহণের পথটিকে কেবল সুগম করে।

জটিলতা, বিশেষজ্ঞপ্রাধান্য, কূটকৌশল আর গোপনতা প্রমুখ লক্ষণগুলি কেবল রাষ্ট্র-রক্ষা ও প্রশাসনের জগতেই নয়, আধুনিক সমাজে অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেই ক্রমশ প্রকট হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রয়াসের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে আর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অভ্যুদয় ঘটেছে। বলা বাহুল্য যে জটিলতাবৃদ্ধি ইত্যাদি যেমন সাহায্য করেছে পরিকল্পনাপ্রবণতাকে পরিকল্পনাপ্রবণতাও তেমনই সাহায্য করেছে বিশেষজ্ঞপ্রাধান্য ইত্যাদিকে। শ্রেণী-গোষ্ঠী-গত স্বার্থে যে এই যুগপৎ সংঘটিত ব্যাপার দুটিকে সচেতনভাবে ত্বরান্বিত করা হয়েছে—এতেও কোনো সন্দেহ নেই। এই বিবিধ পারস্পরিকসম্পর্কবিজড়িত ঘটনাস্রোতের স্পষ্টতম-নিদর্শন সমসাময়িক আর্থনীতিক পরিকল্পনা।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রুশদেশে যে সর্বব্যাপী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার গোড়া-পত্তন হয়েছিল তার মূলে ছিল চারটি প্রধান হেতু : রুশ ঐতিহ্য, এক বিশেষ ধরনের সমাজ-তন্ত্রবাদ, যুদ্ধকালীন অবস্থা, এবং অবশ্যই, আর্থনীতিক তথা সামাজিক বনিয়াদের ক্ষয়ী-ভবন। যুদ্ধ, বিশেষত তা যদি প্রায় অথবা পুরোপুরি সার্বিক যুদ্ধের লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহলে, সচরাচর যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়াসই প্রতিষ্ঠিত সেসব ক্ষেত্রেও কঠিন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ যেন অমোঘভাবেই স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। পরবর্তীকালে রুশিয়া আর রুশ নেতৃত্বাধীন দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার স্থান যে বিস্তৃত আর দৃঢ় হতে থাকল, তার অন্যতম কারণ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির প্রসার। তবে, সম্ভবত, রুশ ব্যবস্থায় একটি গূঢ় সামঞ্জস্য বরাবরই ছিল সামাজিক বন্দোবস্ত আর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে।

তৃতীয় দশকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি যখন আর্থনীতিক পরিকল্পনার পথে প্রথম পদক্ষেপ করল, তখনও সেটা আপৎকালীন ব্যবস্থাই ছিল—কেইন্‌স্, হ্যান্‌সেন্ প্রদর্শিত পন্থায় প্রচণ্ড আর্থনীতিক মন্দার মোকাবিলা করতে। অবশ্য, উন্মুক্ত সমাজব্যবস্থায় পরিকল্পনার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ, মূল উদ্দেশ্যও ছিল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে বাতিল না করে দিয়ে, বরং তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। চতুর্থ দশকে কিন্তু বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসী যুদ্ধের ভয়ংকর তাগিদ মেটাতে গিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান স্বভাবতই অনেক সংকীর্ণ হয়ে এল; নামে আর বেনামে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পরিধি বিস্তৃতার লাভ করল অতি দ্রুত, এবং নাচার জনসাধারণের দিক থেকে বিনা প্রতিবাদে।

প্রধানত রুশ আর মার্কিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, তাঁর বিতর্কের কাল গিয়েছে : সমাজের দীর্ঘমেয়াদী আর যথার্থ স্বার্থ সাধনের পথে কোন্‌টি বেশি নির্ভরযোগ্য আর

যুক্তিসংগত রাস্তা—ব্যক্তিগত প্রয়াস না কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা? পঞ্চম দশকে পৌঁছিয়ে দেখা গেল যে সেই দীর্ঘ বিতর্কের অবসান ঘটেছে : পরিকল্পনার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বিশেষ নেই, তর্ক তার পরিধি সম্বন্ধে। অর্থাৎ সমাজজীবনের কত পরিমাণ অংশ নীত হবে কেন্দ্রগত পরিকল্পনার আওতায়। ষষ্ঠ দশকের অভিজ্ঞতায় এর ঔপপত্তিক ভিত বহুবার নাড়া খেলেও, পরিকল্পিত কার্যক্রমের প্রায় যন্ত্রসুলভ কার্যকারিতায় বিশ্বাস এ-যুগের এক অন্যতম সংস্কারস্বরূপ।

স্মরণ রাখতে হবে যে পঞ্চম দশকে (বা তার পরেও!) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জের অব্যা-হত ছিল। রুশ-মার্কিন উভয় মহাশক্তিরই অভিপ্রায় ছিল প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনো উপযুক্ত উপায়ে নিজ নিজ ক্ষমতা বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের বিস্তৃতি ঘটানো। এবং এই বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যতম হাতিয়ার ছিল যুদ্ধধ্বস্ত বা অনুন্নত দেশগুলিতে সামাজিক আর আর্থনীতিক পুনর্গঠন বা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি। 'সাম্রাজ্যবাদ' 'স্বাদেশিকতা' ইত্যাদি ধারণায় অনেকেরই মানসিক স্থৈর্য ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু চতুর্থ দশকের শেষাংশ থেকে শুরু করে ষষ্ঠ দশকের সমাপ্তি পর্যন্ত যে শত শত জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনা আর রূপায়ণ (?) দেখতে পাওয়া গেল, তাদের কল্যাণে (বিশেষত এশিয়া আর আফ্রিকার) কটি জাতি প্রকৃতই লাভবান হল তার হিসাব মেলা ভার হলেও, মহাশক্তি দুটির এবং পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির রাজনীতিক আর আর্থনীতিক মুনাফা অতি স্পষ্ট। (পরিকল্পনাধীন দেশে, ক্ষমতাভোগী এবং একশ্রেণীর বিশেষজ্ঞগোষ্ঠীরও মুনাফা স্পষ্ট।)

এইভাবে, আর্থনীতিক তথা সামাজিক জটিলতা ইত্যাদির বৃদ্ধি ব্যতীত, আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও একটি প্রধান কারণ হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বব্যাপী আসক্তির। ভারতবর্ষের মতন একটি দেশ, যেখানে বৃহৎ পরিধির পরিকল্পনার ইতিহাস ইতিমধ্যেই বেশ দীর্ঘ, সেখানে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে যে, অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে কেন্দ্রগত পরিকল্পনার মৌলিক বিবাদ সত্ত্বেও, এবং প্রথম অধ্যায়ে পরি-কল্পনার উদ্দেশ্য এবং পরিধি সীমাবদ্ধ থেকে থাকলেও, পরিকল্পনাসংক্রান্ত মানসিকতা এবং কার্যকলাপের এক প্রবল প্রবণতা আছে ক্রমবিস্তারের প্রতি। ব্যক্তিগত প্রয়াসকে খর্ব বা ব্যাহত বা নিয়ন্ত্রিত করে কেন্দ্রীয় চিন্তা এবং শাসনকে একবার প্রতিষ্ঠা দিলে, কেন্দ্রগত পরিকল্পনার সাফল্য-অসাফল্যনির্বিশেষে, সামাজিক অস্তিত্বের বৃহত্তর অংশ প্রায় অনিবার্যভাবেই আসতে থাকে পরিকল্পনার আওতায়।

এর অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায় যে বিগত যুগে যেসব সামাজিক ক্রিয়া ঘটত ব্যক্তিগত নেতৃত্বে, আগামী যুগে তা বহুলাংশে থাকবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে। লোক বা অর্থ বা অন্যান্য উপকরণের পরিমাণগত ও কালানুক্রমিক নিয়োগ হতে থাকবে সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী। ফলত, গোপনতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে, এবং সেইসঙ্গে (অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে) সামাজিক উন্মুক্ততারও হ্রাস পাবার সম্ভাবনা।

আজকে যাঁরা অর্থনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অন্যান্য সামাজিক তত্ত্বের নতুন ছাত্র, তাঁদের কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে যে সামান্য দুই-পাঁচ দশক আগেও শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতির সঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার যোগাযোগ তো বিশেষ ছিলই না, সরকার তথা কেন্দ্রীয় কর্তৃ-পক্ষের যোগাযোগ ছিল বহুলাংশে ক্ষীণ, পরোক্ষ আর অ্যাড্ হক্। এমনকি মাত্র পাঁচ-সাত দশক পূর্বেও, শিল্প-বাণিজ্য তো বটেই, যোগাযোগ- বা পরিবহণ-ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল অনেকাংশে ব্যক্তিগত প্রয়াসের ক্ষেত্র। এবং একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে বিভিন্ন সামা-

জিক ক্রিয়ার সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয়করণ অংশত পূর্বতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলির ব্যর্থতাসঞ্জাত হলেও, অংশত তার উৎপত্তি এই পূর্বে উল্লিখিত পরিকল্পনা (তথা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ) -প্রবণতার স্বয়ংস্ফূর্তীত দরুন। বলা বাহুল্য যে উচ্চআকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন নেতৃত্বপরায়ণ ব্যক্তিদের আর গোষ্ঠীগুলির স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র স্বাধীন তৎপরতার থেকে দ্রুত মোড় ঘুরেছে কেন্দ্রীয় শাসন তথা পরিকল্পনার অধীন ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রের দিকে। এমনকি, ব্যক্তিগতমুনাফা-কামী ব্যবসায়ী বা শিল্পনায়ককেও আজ কেবল প্রকৃতি বা শ্রমজীবী বা অন্য ব্যবসায়ীর সঙ্গেই তাল মিলিয়ে চলতে হয় না, তাল মেলাতে হয় বিবিধ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সঙ্গে এবং মুনাফা খুঁজতে হয় কেন্দ্রশাসিত জগতের সীমানার মধ্যে। অর্থাৎ, পরিকল্পনার প্যারা-মিটরগুলিও ব্যবসায়িক বিচারের বিষয়বস্তু।

সমাজের সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার এবংবিধ প্রসারের ফলে ব্যক্তি তথা জন-সাধারণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাধিকারীদেরই যে শুধু দূরত্ব বাড়তে পারে তাই নয়, সাধারণের আত্মিক যোগাযোগও সামগ্রিক পরিকল্পনাটির সঙ্গে ক্ষুণ্ণ বা ছিন্ন হবার সম্ভাবনা। একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানুষের সংখ্যা বিশ থেকে বিশ হাজার হলে যদি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নষ্ট হয় তো পরিকল্পনাধীন মানুষের সম্পর্ক বিশ কোটিতে দাঁড়ালে সে-সম্পর্ক যে সহজেই বিঘ্নিত হতে পারে তাতে আশ্চর্য কী ? অথচ এ-কথা তো বহুবিদিত যে যুদ্ধক্ষেত্রের মতন যে-কোনো কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন পরিস্থিতিতে অ-চেতন যন্ত্র-সদৃশ সৈন্য অপেক্ষা স-চেতন অংশগ্রহণকারী সৈনিক অনেক বেশি কাম্য। অর্থনীতির সংশয়াচ্ছন্ন ভূমির বাইরেও, শিক্ষা বা সংস্কৃতি বা বিজ্ঞানের জগতে, সাধারণ মানুষ যে শুধু চরম লাভ-ক্ষতির অংশীদার তাই নয়, তার যোদ্ধৃসুলভ কুশলতা আর তন্নিষ্ঠ বুদ্ধিমত্তাই তো বিবিধ পরিকল্পনা আর কার্যক্রমের সংগ্রামে প্রধানতম সহায়।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও এই মৌল সমস্যাটি সম্বন্ধে (কিছুটা বাধ্যতামূলকভাবেই) অব-হিত। একনায়কতন্ত্রের রঙীন মিথ্যা প্রচার থেকে শুরু করে, গণতন্ত্রে প্রচলিত বিবর্ণ জন-সংযোগব্যবস্থা পর্যন্ত তার প্রমাণ। সাধারণ মানুষকে প্রত্যুত্তর বা প্রশ্ন করবার স্বাধীনতা বা সুযোগ সর্বদা না দিলেও, এর দ্বারা গড়ে তোলা হয় (কিংবা গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়) তাদের সমর্থন, সহযোগিতা আর অংশগ্রহণের পটভূমিকা। দ্বিতীয়ত, সমস্ত পরি-কল্পনার চরম অভীষ্ট হিসেবে, জনসাধারণকেই কোনো কোনো সময়ে অল্প-বিস্তর বিচারের অবকাশ দেওয়া হয়—ক্ষমতারূঢ় গোষ্ঠী কী কী করতে বা করাতে চাইছেন, বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যেই পারস্পরিক সংগতি কতদূর, এবং অনুসর্তব্য পন্থার যৌক্তিকতা কোথায় ? ভারত-বর্ষীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির রচনা-কালীন আলোচনা আর অবশেষে প্রকাশিত পরিকল্পনা-গ্রন্থগুলিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জটিলতাবৃদ্ধি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশেষজ্ঞতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, পরিকল্পনা-সংক্রান্ত বিতর্ক একটি নূতন দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে : যে-কোনো একটি পরি-কল্পনার আয়তন, বিষয়, লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদিরও পূর্বে, প্রধান বিচার্য হয়ে ওঠে পরি-কল্পনাটির মূল দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থাৎ, পরিকল্পনা যদি হয় কার্যক্রমের প্রস্তুতি, তো এই প্রস্তাবনাকে অভিহিত করা যায় পরিকল্পনারও প্রস্তুতি বলে। পরিকল্পনাতে বর্ণিত হয় অগ্রগতির 'কী', 'কতটা', 'কবে' এবং 'কোথায়'। প্রস্তাবনাতে ব্যস্ত হয় 'কেন' এবং 'কীভাবে'। পরিকল্পনার সব খুঁটিনাটি বর্জন করে শুধু তার কাঠামোটি, ঐ কাঠামোটি নির্মাণ করতে যে পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেই মূল পদ্ধতি বা কৌশলটি, সমাজের

কোন্ কোন্ বিশেষত্বের দরুন বা প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে পদ্ধতিটি গৃহীত হয়েছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে, পূর্বে অনুসৃত পদ্ধতি তথা পরিকল্পনা(গুলি)র ত্রুটি—এই চারদফা আলোচনাই সাধারণত হয়ে থাকে প্রস্তাবনার প্রধান বিষয়বস্তু।

এটা লক্ষণীয় যে পরিকল্পনার বিপুলতা এবং জটিলতা প্রমুখ বৈশিষ্ট্যগুলির দরুন, বিস্তৃত একটি পরিকল্পনার যথাযোগ্য আলোচনা শিক্ষিত, সাধারণ, অ-বিশেষজ্ঞ মানুষের আয়ত্তের বহির্ভূত হলেও, এই ধরনের একটি প্রস্তাবনা সম্বন্ধে ফলপ্রসূ আলোচনার জন্যে বিশেষজ্ঞতা তেমন অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়—যদি না আর্থনীতিক পরিকল্পনার সমসাময়িক রেওয়াজ অনুযায়ী, মূল পদ্ধতির আলোচনাটিকে কিছুটা কৃত্রিম আর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে দুর্বোধ্য করে তোলা হয়। বস্তুতপক্ষে, কোনো একটি অতিজটিল বিষয়েও, প্রাথমিক প্রস্তা-বনাটি যে সরল, সাধারণবুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে তার বিশিষ্ট প্রমাণ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা পরিষদ ('ন্যাশনল কমিটি অন সায়ন্স অ্যান্ড টেক্‌নলজি') কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত জাতীয় বিজ্ঞান পরিকল্পনার প্রস্তাবনাপত্রটি "অ্যান অ্যাপ্রোচ টু দ সায়ন্স অ্যান্ড টেকনলজি প্লান"। অতীতে, বিজ্ঞান তো বটেই, প্রযুক্তিবিদ্যাও প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই বিষয় ছিল। কোন্ পরিস্থিতিতে, কী উদ্দেশ্যে তা বহুত্তর সামাজিক কার্যক্রমের অন্তর্গত হল সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে, এইটুকু অবশ্যই বলা যায় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা-সংক্রান্ত উন্নতি ঘটানো বা তাকে অব্যাহত রাখা কেবল ভারতবর্ষেই নয়, প্রায় সমস্ত উন্নত ও উন্নতিকামী দেশেরই সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তর্গত। এ-সম্পর্কে মূল চিন্তাধারাটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় এইভাবে : বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তিবিদ্যায় যথেষ্ট প্রগতি ব্যতিরেকে সামাজিক ও আর্থনীতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। সুতরাং, কৃষি বা শিল্প বা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন এই ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা অনুযায়ী লোক-অর্থ-উপকরণ বিনিয়োগ প্রয়োজন। এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিকল্পনার অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের মতন এখানেও কালানু-ক্রমিক এবং অল্প-বিস্তর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-মাত্রা বা অভীষ্ট লাভের আশা ব্যক্ত হয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-সংস্কৃতির জগতে পরিমাণসূচক লক্ষ্য-মাত্রা প্রভৃতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা পরে করা যেতে পারে, তবে এ-কথা ঠিক যে মোটামুটি কালানুক্রমিক লক্ষ্য-মাত্রা অথবা পরিসংখ্যানগত অভীষ্ট স্থির না করে দিলে, পরিকল্পনাপদ্ধতির একটি মূল উপাদান-ই বাদ পড়ে গেল। অর্থাৎ, পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যাপারের মতন, পরিকল্পনাধীন বিজ্ঞানেও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরিষদকে বলতেই হবে যে কতদিনের মধ্যে, কোন্ দিকে, কতটা অগ্রগতির কথা চিন্তা করা হচ্ছে—জাতীয় কী কী সম্পদ বা উপকরণ কতটা পরিমাণে নিয়োগ ক'রে। জাতীয় সম্পদ বা উপকরণ যেহেতু সীমাবদ্ধ, এ-ধরনের চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থই হল যে ঐ ঐ সম্পদ আর উপকরণ অন্যান্য কাজে ব্যয়িত না হয়ে, অথবা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণে ব্যয়িত হয়ে, ব্যয়িত হতে থাকবে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জন্যে। অর্থাৎ, জাতীয় স্বার্থে, অন্যান্য জিনিসের তুলনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বস্তুত, সামাজিক এবং আর্থনীতিক অভীষ্টগুলির গুরুত্ব বর্তমান যুগে এত সর্বজনস্বীকৃত যে সে-সম্বন্ধে নতুন করে প্রচারের প্রয়োজন প্রায় নেই। কোনো কোনো আর্থনীতিক পরিকল্পনার অ্যাপ্রোচ পেপার যখন প্রকাশিত হয় তখন তার উদ্দেশ্য সাধারণত কী থাকে তা এই প্রবন্ধে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। বিজ্ঞান-পরিকল্পনা সংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ্ পেপার-টি কিন্তু মূলত ভিন্ন-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : বৃহৎ সামগ্রিক পরিকল্পনা

(উন্নয়নমূলক বা সামরিক-উদ্দেশ্যমূলক বা মন্দা-প্রতিরোধমূলক)-র অংশ হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির খাতেও সম্পদ ব্যয় হয়েই থাকে। কিন্তু কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্যেই একটি গোটা পরিকল্পনা এই প্রথম। অতএব এর উদ্দেশ্য : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা, ঐ বিষয়েই একটি পরিকল্পনা রচনা আর রূপায়ণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা এবং তার স্বপক্ষে 'জনমত' সংগঠন, এবং অন্যান্য সমস্ত অ্যাপ্রোচ্ পেপার-এর অনুরূপ পন্থায় সমাজের বিস্তৃত অংশের সক্রিয় সহযোগিতা তথা অংশগ্রহণ নিশ্চিত (?) করা। বলা বাহুল্য যে এই বিবিধ উদ্দেশ্যগুলি অনেকাংশেই প্রিজান্শন-ভিত্তিক বা যুক্তিনির্ভর অনুমানমাত্র; এত স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ কোথাও হয়নি। কিন্তু আরও একটু গভীরভাবে দেখলে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক কিছু উদ্দেশ্যও যেন চোখে পড়ে। যেহেতু তা প্রচ্ছন্ন, এবং হয়তো এই দলিলটির রচয়িতাদেরও অনেকের সজ্ঞান চিন্তার বহির্ভূত, সেইহেতু তার আলোচনা অনুমানসাপেক্ষ এবং জটিল হলেও অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্রীভূত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। গবেষক এবং শিক্ষক হতেন একই ব্যক্তি। এর সামান্য ব্যতিক্রম ছিল গুটিকতক সম্পূর্ণে গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান—সরকারী অথবা বে-সরকারী উদ্যোগে। কেবল নেতৃস্থানীয় গবেষকরাই নয়, সর্বস্তরের কর্মীরাই ছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে দেশপ্রেমী, বিজ্ঞানসাধনা ছিল সমাজসেবার অঙ্গবিশেষ। প্রায় উঞ্ছবৃত্তিধারী, আদর্শবাদী মানুষগুলি ব্যবসায়িক অসফলতা সত্ত্বেও, সামাজিক অনাদরের মধ্যেও নিঃসন্দেহে ছিলেন সম্মানের পাত্র। স্বাধীনতা-উত্তর কালে, অর্থাগমের ধারা যখন সহসা প্রবল হয়ে উঠল তখন বহু গবেষক আর বিজ্ঞান-প্রেমী অবশ্যই নিশ্চিত বোধ করেছিলেন আর্থনীতিক অনিশ্চয়তার অবসানে। কেবল তাই নয়, তাঁদের সামাজিক মর্যাদার বৃদ্ধি ঘটলো, নেতৃস্থানীয় গবেষকরা ক্ষমতা আর প্রতি-পত্তির সোপান দ্রুত অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হলেন শাসকশ্রেণীর মধ্যে। সাধারণ গবেষক বা বিজ্ঞানকর্মীরাও কালক্রমে ত্যাগ করলেন (আদর্শবাদী অথবা বাধ্যতামূলক !) আত্মত্যাগের পথ। বিজ্ঞানব্রত, অন্যান্য বহু সৃজনধর্মী জীবনপথের মতন রূপান্তরিত হল জীবিকা বা কেরিয়ার-এ। কোনো সামাজিক পরিস্থিতিতে, শিল্পায়ন বা উন্নয়নের একটি লক্ষণ বা ফল স্বরূপ, এই বিশেষ রূপান্তরের অন্যতম সুফল হল—প্রফেশনালাইজেশন বা বিশেষজ্ঞতা-বৃদ্ধি এবং শৃঙ্খলাবৃদ্ধি। আমাদের দেশেও যে তা ঘটল না তা নয়, পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির কারিগরি কুশলতা অবশ্যই বেড়েছে। তা-ছাড়া, বিজ্ঞানের সেবার সঙ্গে অনশন-অভ্যাসের দীর্ঘ সম্পর্কের অবসানও আনন্দের কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে, বিজ্ঞানসেবীদের মানসিকতায় এসেছে এক অশুভ পরিবর্তন।

আগে তাঁরা বিজ্ঞানসেবাকে জড়িত করেছিলেন আদর্শবোধ অথবা ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সঙ্গে। তাঁরা প্রায় ধরেই নিতেন যে যশ বা সম্মান পান বা না পান, অর্থ তাঁরা পাবেন না। সুতরাং, ব্যক্তিগত বিচ্যুতি বাদ দিলে, কোনো সাধারণ দ্বন্দ্ব ছিল না এ-বিষয়ে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, স্বীকৃতি আর অর্থের গুরুত্ব তাঁদের জীবনে যখন সচেতন স্থান পেতে থাকল, সেই পরিস্থিতিতে, আদর্শবান আর কুশলী বিজ্ঞানকর্মী স্বভাবতই লাভ করেন সামাজিক স্বীকৃতি আর অর্থলাভও তাঁদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। আদর্শ সমাজব্যবস্থায়, এই ধরনের বৈষয়িক লাভের সঙ্গে পেশাগত আর আদর্শগত লাভের সংঘাত অপেক্ষাকৃত বিরল। অর্থাৎ সেই পরিস্থিতিতে, আদর্শবান আর কুশলী বিজ্ঞান কর্মী স্বভাবতই লাভ করেন সামাজিক স্বীকৃতি, সমৃদ্ধি ইত্যাদি। নানা কারণে, ভারতবর্ষের অবস্থা স্বতন্ত্র : যথার্থই আদর্শবান

আর কর্মনিষ্ঠ হলে, বৈষয়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং, অতি স্বাভাবিক রীতিতেই, বহু বিজ্ঞানকর্মী ধারমান হলেন অ-বৈজ্ঞানিক অভীষ্টের উদ্দেশে। ব্যবসায়ী বা তথাকথিত শিল্পনায়করা যেমন বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রকৃতি-প্রযুক্তি-প্রতিবন্ধীদের পরিবর্তে সরকারকেই ধরে নিয়েছেন প্রধানতম প্রতিযোগী হিসেবে, এবং তার ফলে, অবশ্যান্-যায়ী, উৎপাদন বাড়ানো বা তার খরচ কমানোর তুলনায় সরকারী ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করার তাগিদ বেশি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যথাযথ গবেষণার তুলনায় গবেষণার অনুকরণ করা বা সরকার কি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খুশী করে চলার ব্যবহারিক সার্থকতা বেশি। অর্থাৎ শিক্ষকতার তুলনায় গবেষণার বৈষয়িক সার্থকতা যেমন বেশি, প্রকৃত তন্ময় গবেষণার তুলনায় এইজাতীয় বিজ্ঞাপনধর্মী গবেষণারূপী কার্যকলাপের সার্থকতাও তেমনই ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি লাভ করেছে বর্তমান সমাজে।

সমসাময়িক বিজ্ঞাপনজগতের ধারা অনুযায়ী, অন্তঃসারশূন্য, সামাজিকদায়িত্বজ্ঞানহীন, দৃষ্টি-আকর্ষণকারী কপট প্রকটতা এইভাবে সুদৃঢ় হয়েছে বিজ্ঞানীদের মানসিকতায়। প্রযুক্তি-বিদদের কর্মপদ্ধতিতে ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপার অপেক্ষাকৃত দুরূহ হলেও, যথেষ্ট ব্যবহৃত। এবং প্রযুক্তিবিদরাও এই সর্বব্যাপ্ত চরিত্রহীনতা ও সিনিসিজ্ম্-এর সংক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। অথচ, প্রায় সমস্ত দেশে আর সমাজেই একটি বিশেষ হীনম্মন্যতা অত্যন্ত প্রবল : অষ্টাদশ কি উনবিংশ শতাব্দীতে যখন তৎকালীন বিজ্ঞানসেবীরা অনাগত বিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড প্রগতির বনিয়াদ স্থাপন করছিলেন, সমসাময়িক সমাজ তখন তাঁদের অবজ্ঞা বা উপহাস করেছিল। পরবর্তী কালে, বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে এসে, সকলে যখন 'স্বপ্ন-বিলাসী' বিজ্ঞানীদের রোপিত প্রযুক্তি-বৃক্ষের বৈষয়িক তথা ব্যবহারিক ফলের স্বাদে চমৎকৃত হলেন, এবং বিশেষত যখন আন্তর্জাতিক সামরিক আর আর্থনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখন অতীত ত্রুটি সংশোধনের উদ্ভ্রান্ত প্রয়াসে অর্থ, উপকরণ ও সম্মান (?)-এর বন্যা বয়ে গেল দেশে দেশে। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক যুগেও বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে শাসকদের মনে ঐ একই জাতীয় অস্ফুট সমীহমিশ্রিত দূরে-সরিয়ে-রাখা ভাবই ছিল প্রবল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেও সেই একই হীনম্মন্যতা অধিকার করল তাঁদের বিচার-বুদ্ধিকে—তাঁরা তৎপর হলেন যে কীভাবে ও কত দ্রুত বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আদায় করা যায় প্রগতির সূত্র। ভারতবর্ষের অবস্থা আরো জটিল এই কারণে যে এ-ক্ষেত্রে সমগ্র সমাজই ভুগছে অন্যান্য দেশের সম্পর্কে হীনম্মন্যতায়। (প্রধানত পাশ্চাত্যে) আন্তর্জাতিক প্রতি-দ্বন্দ্বিতার একটি মূল্যবান লক্ষণ ছিল এই যে অসার বা অপচয়ী ব্যাপার স্বতঃই নিবৃত্ত হত নির্মোহ মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু, ঔপনিবেশিক-উত্তর রাজনীতির অসাধু রীতি অনু-যায়ী, ভারতীয় বিজ্ঞান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের ছাড়পত্র লাভ করল অতি সহজে—শিশুদের 'এলে-বেলে খেলার'-ই অনুরূপ !

এই বহুবিধ জটিলতার সম্মিলিত ফলস্বরূপ, ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার জগতে যা ঘটেছে তাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় একটি বিরাট ব্ল্যাকমেল রূপে। সার্থক সাধনা অবশ্যই কিছু কিছু হয়েছে, আত্মত্যাগী সাধকও কিছু আছেন। কিন্তু শ্রেণীগতভাবে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু দিতে পারেন নি যার দ্বারা তাঁদের (তুলনামূলকভাবে) এত দ্রুত বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধিকে যুক্তি-যুক্ত বলা যেতে পারে। ক্ষুদ্রস্বার্থসন্ধানী রাজনীতিকে নেতৃত্বের অনুসরণে আর সহযোগিতায় তাঁরা ক্রমাগতই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন এমন এক বিজ্ঞানকে যা অতি মনোরম এবং উজ্জ্বল, কিন্তু এই বিশাল দরিদ্র সমাজের প্রকৃত অবস্থা আর প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। সাধারণ

বিজ্ঞানাভিজ্ঞ মানুষ আশা করেছে এতাবৎ অবহেলিত প্রাকৃতিক আর মানবিক সম্পদের যথা-যথ ব্যবহার, এবং সেই আশায় যথেষ্ট প্রিভিলেজ্-এ লালন করেছে ক্রমস্ফীত বিজ্ঞানী সম্প্রদায়কে। গবেষণার সঙ্গে আর্থনীতিক বা সামাজিক উন্নতির অত সরল আর প্রত্যক্ষ কোনো যোগসূত্র না থাকলেও, ষষ্ঠ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ভারতীয় আর্থনীতিকদের মতন ভারতীয় বিজ্ঞানীদেরও মূলগত অনুর্বরতা বেশ অস্বস্তিকরভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে। এবং এ ধরনের সংকটকালে যা বহু সময়ে হয়ে থাকে, শ্রেণীগতভাবে পারম্পরিক দোষারোপও বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছে। অনুমান করা যায় যে পেশাদার বুদ্ধিজীবী হিসেবে, বিজ্ঞানকর্মীদের গাত্রত্বকের স্থূলতা সম্ভবত রাজনীতিক বা ব্যবসায়ীদের তুলনায় কম! খুব ক্ষীণ হলেও, তাঁদের শ্রেণীগত বিবেকের কণ্ঠস্বর যেন এখনও শ্রুতিগোচর, আলোচ্য আপ্রোচ্ পেপারটিও মনে হয় জড়তাদুষ্ট আত্মজিজ্ঞাসারই প্রকাশস্বরূপ। অর্থাৎ, যে কোনো পরিকল্পনার পরিকল্পনাসুলভ উদ্দেশ্য ব্যতীত, এর একটি মূলগত উদ্দেশ্য হল শ্রেণীগত নিষ্ফলতার সাফাই গাওয়া। বিগত আড়াই-দশক-ব্যাপী অর্থহীন অদূরদর্শী প্রয়াসের ক্ষেত্রেও যেমন নেতৃস্থানীয় (?) বিজ্ঞানীরাই ছিলেন অধিকতর স-চেতন এবং অভিসন্ধিপরায়ণ, বর্তমান সংকটমুহূর্তেও অবশ্যই তা-ই বাকি অধিকাংশেই পাপী গড্ডলিকাপ্রবাহীর ভূমিকায়। কিন্তু এই দলিলটিও যে সৎ, বলিষ্ঠ ও সুবুদ্ধিমান নয় তার পরিচয় যথেষ্ট আছে।

ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই অনেকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন সেই অদ্ভুত তথ্যটি : দলিলটি বহুলাংশে গৃহীত একটি বিদেশে প্রস্তুত ও প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে। অর্থাৎ, আমাদের দেশের বহু সমস্যার ব্যবহারিক সমাধানের জন্য যাঁদের দিকে সচরাচর তাকিয়ে থাকি, তাঁরাই, এই ঘোর বিপদসঙ্কুল সময়েও, আত্মনির্ভরতার সঙ্গে কোনো ঔপদত্তিক ফর্মুলাও দিতে পারলেন না দেশবাসীকে! সুতরাং, এ-জাতীয় রচনার রীতি অনুযায়ী তাঁরা যখন বলেছেন যে গ্রামপ্রধান ভারতবর্ষে বিজ্ঞান সওয়ার করতে হবে গ্রামে, এবং গ্রামীণ ভারতের আশু সমস্যা-গুলির সমাধানে প্রযুক্তি আর বিজ্ঞান প্রয়োগের যা যা অসুবিধা বা বাধা তার অপসারণ প্রয়োজন, কিংবা যখন বলেছেন যে স্বয়ম্ভরতার প্রশ্নই আসল প্রশ্ন, তখন পুনঃপুন মনে যে সন্দেহ জাগে তা হল—তাঁদের এই উপলব্ধিগুলির গভীরতা সম্বন্ধে। এ-সব সুন্দর বক্তব্য তো জাতিপুঞ্জ থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের আলোচনাসভাগুলিতেও প্রায়শঃই শোনা যায়!

কেন্দ্রীয়-পরিকল্পনাধীন ও দ্রুতবর্ধনশীল যে কোনও বিষয়ের মতন বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যাও বর্তমানে এত জটিল এবং বিশেষজ্ঞতা-বেষ্টিত যে সাধারণ মানুষের পক্ষে 'হাতে হাতে ফল পাওয়া বা না-পাওয়া' বিনা অন্য কোনো মাপকাঠি ব্যবহার করা বড়ই কঠিন। উপরন্তু, গোপনীয়তা ইত্যাদির বাধাও আছে। তবুও, সাধারণ মানুষ হয়তো কিছুটা আহ্বাদিত যে এই দলিলটিতে সরকারীভাবে অন্তত এইটুকু স্বীকার করা হয়েছে যে বিজ্ঞান (ও প্রযুক্তিবিদ্যা)-র সঙ্গে আর্থনীতিক (এবং সামাজিক) উন্নতির যোগাযোগ ঘটানো একটি অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃত আদর্শবান বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে সুবিধাবাদী বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীরা অবধি বহুজনে এত দীর্ঘকাল দাবি করে এসেছেন বিজ্ঞানের 'স্বাধীনতা' (বা দায়িত্ব-হীনতা?)—যে এই ধরনের সামাজিক কর্তব্য নির্ণয় নিঃসন্দেহে শুভসূচক।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও অর্থবরাদ্দের অপেক্ষাধীন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সামাজিক জরুরী ব্যাপারগুলির পরিবর্তে অন্যান্য কিছু স্বল্প-জরুরী ব্যাপার প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে এতকাল—তারও স্বীকৃতি আছে। বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের ব্যক্তিগত ক্ষমতাই যে বহুলাংশে হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণ-নির্ধারক—তারও উল্লেখ আছে।

অথচ এই দলিলটির রচয়িতাদের অন্যতম সুপারিশ হল ইতিমধ্যে যে-সব প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎ আকার ধারণ করেছে (অর্থাৎ যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে পূর্বে উল্লিখিত সূত্রে!) তাদেরই প্রতি আরো দৃষ্টি দিতে হবে—দেশে প্রযুক্তিবিপ্লব সংঘটনের উদ্দেশ্যে। এ-ধরনের অযৌক্তিকতার বা অগভীর চিন্তার ইঙ্গিত আরো অনেক আছে অ্যাপ্রোচ্ পেপার-টিতে : বিজ্ঞানগবেষণার সঙ্গে প্রযুক্তিবিকাশের এবং বিকশিত প্রযুক্তির সঙ্গে শিল্পজগতের ঘনিষ্ঠ আর শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন তা বলা হয়েছে, কিন্তু অনুরূপ সদিচ্ছা ইতিপূর্বে অসংখ্যবার উচ্চারিত হলেও কেন তা ঘটেনি, অর্থাৎ ক্ষমতাধিকারী আর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং তাঁদের আশ্রিত সুবিধাভোগী শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁরা নীরব। ঐ একই রীতিতে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্তভাবে ঘোষণা করেছেন যে বিদেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা ধার না করে বরঞ্চ স্বদেশীয় প্রযুক্তি গড়ে তোলা উচিত। অবশ্যই। কিন্তু ঐ একই বক্তব্য বারংবার শোনা গিয়ে থাকলেও, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থার যোগাযোগ এবং আশু লাভের অদূরদর্শী চিন্তায় সে-পরিচ্ছেদ কেন ব্যাহত হয়েছে তার কোনো আলো-চনাও হল না, প্রতিকার তো নয়ই।

সুতরাং, বেশ কয়েকটি সদিচ্ছা প্রকাশিত হয়ে থাকলেও কোনো ক্রান্তিসূচক পরি-বর্তনের আভাস এই দলিলটিতে পাওয়া গেল না। যদিও, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, দলিলটির রচনাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সহস্রাধিক কর্মী! দলিলটির মধ্যে হয়তো একটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য স্থান পেয়েছে : বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজন অনুযায়ী, নিয়োগ করতে হবে সমাজের সর্ববিধ শক্তি : আর্থনীতিক, আইনগত, রাজনীতিক ইত্যাদি। অর্থাৎ 'সামগ্রিক পরিবর্তন'। সামগ্রিক পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত, কারণ দেশের সর্ব অংশে আর সমাজের সর্ব-ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের প্রাদুর্ভাব অতি প্রকট। সামগ্রিক প্রয়োজন নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সামগ্রিক পরিবর্তন সূচিত হলে আনন্দের কথা বটেই। কিন্তু, প্রসঙ্গত, সামগ্রিক পরিবর্তন কালক্রমে প্রকৃতই সামগ্রিক হলেও, সূচনায় তা অংশবিশেষেই আবদ্ধ থাকে সাধারণত। এবং সেইহেতু, কোনো সামগ্রিক পরিবর্তনের সূত্রপাত বহু সময়ে ঘটে নেতৃস্থানীয়দের দ্বারা। তাঁরা দলগত বা শ্রেণীগতভাবে সেই ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করেন বিপুল সামাজিক টেন্‌শন্ (উদ্দীপন) ব্যবহারের দ্বারা। অতএব, আপ্রোচ্ পেপারটির সর্ববিধ ত্রুটি সত্ত্বেও তা সার্থকতার স্পর্শ পেত যদি না তেমন কোনো উদ্দীপনা সঞ্চার বা ব্যবহারের বিন্দুমাত্র আভাস এই দলিলটিতে অনুপস্থিত থাকত। সুতরাং, এই অভিনব পরিকল্পনার পরিকল্পনাটি দুটি বিশেষ অর্থে বিফল : প্রকৃত পরিবর্তনের মানসিকতা জাগরূক করতে পারেনি এবং, অংশত তার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে, 'জনসাধারণের' অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেনি। রচয়িতারা স্বয়ং যে দলিলটিকে এক্‌সার্‌সাইজ্ নামে অভিহিত করেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়!

ফলত, যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে বর্ণিত ঘটনাটি ঘটবার : তথাকথিত আত্মসমালোচনা ও সাধারণে প্রচারিত আলোচনার মধ্যে দিয়ে কেবল সুগম হবে সিংহাসনে আরোহণ-অবরোহণের পথটি। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বিজ্ঞান (এবং অবশ্যই প্রযুক্তি) যখন শক্তি-অর্থ-সুবিধা আহরণের সোপানস্বরূপ, তখন এমন আশঙ্কা না-করার কোনো কারণ নেই। আর এভাবে যদি দলিলটি পর্যবসিত হয় এক মহার্ঘ্য অ্যাপোলজিয়তে, তো তদন্তর্গত লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদির ব্যবহার হবে ঐ একই সুবিধা-ভোগী সম্পদায়ের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধিতে। বিজ্ঞানের উন্নতি কিছু যদিও বা ঘটে তো তা আকস্মিক। নিতান্তই।

এবং, গোপনীয়তা বা বিশেষজ্ঞতা বা সরকার-মুখাপেক্ষী মানসিকতার কল্যাণে, এ-সম্পর্কিত আলোচনার সমাপ্তি ঘটবে একটি পরিকল্পনাতে—যার রচনা বা পরিচালনাতে যথার্থ গণতন্ত্র কোনোক্রমেই কোনো স্থান পেতে পারে না। অথচ, গণতন্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত ঔপপত্তিক আলোচনা স্থগিত রেখেও বলা যায় যে বিজ্ঞানের প্রগতির মূল উৎস ব্যক্তিগত প্রয়াস; সরকারী বা বৃহত্তর সামাজিক প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে কেবল সৃষ্টি করা যায় তার অবশ্য প্রয়োজনীয় ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচার আর মানসিক আবহাওয়া।

অতি সরলীকরণের দরুন ক্ষমা প্রার্থনা করে নিবেদন করা যায় যে প্রকৃত প্রয়োজন এমন একটি পরিকল্পনার, যার দ্বারা (কেন্দ্রীয়) পরিকল্পনার-ই অবসান ঘটবে, অন্তত বিজ্ঞানের জগতে। বস্তুত, বিজ্ঞানের উৎস যখন ব্যক্তিমানস, এবং তার ক্ষেত্র যখন সমাজ, তখন সামাজিক দায়িত্ববোধের বা নিষ্কলুষ সততা ব্যতীত প্রগতি অসম্ভব। বিজ্ঞাপনধর্মিতা বর্জন করার কোনো রোমাঞ্চকর আবেদনেই বিরাট বা আমূল পরিবর্তন আসবে না। বরং প্রয়োজন এমন কিছু সামাজিক (এবং ব্যক্তিগত) মূল্যমানের প্রতিষ্ঠা যা 'সৎ' অথচ বৈষয়িক চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামাজিক আদরকে যদি পুনরায় মোড় ফেরানো যায় শিক্ষক-গবেষক-কর্মীদের প্রতি তো বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের বনিয়াদ নিশ্চিত। সে-অবস্থায়, প্রযুক্তির তাগিদ স্বয়ং সঞ্চারিত হবে সমাজের সর্ব অংশে।

অ-গণতান্ত্রিক কোনো পদ্ধতি সম্ভবত শেষ অবধি কাজে লাগে না।

রীতি বিষয়ক আলোচনা

(যুক্তিকে সুপরিচালিত করার জন্য এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধানের তাগিদে)

রনে দেকার্ত

এদিকে এই সব কথা যে-নিবন্ধে ছিল, তা শেষ করতে পারি আজ থেকে তিন বছর আগে, এবং তখন তাকে কোনো মুদ্রকের হাতে তুলে দেওয়ার অভিপ্রায়ে তাতে আরেকবার চোখ বোলাতে শুরু করি, যখন শুনলাম কিছু আগে অন্য এক ব্যক্তির[১] প্রকাশিত পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক একটি অভিমত নাকি অনুমোদন পায়নি এমন কোনো-কোনো লোকের যাঁরা আমার শ্রদ্ধার পাত্রই শুধু নন, আমার চিন্তার উপর আমার যুক্তিশক্তির যে-প্রভুত্ব থাকে, তার থেকে কিছু কম প্রভুত্ব তাঁদের নেই আমার সকল কর্মের উপর। অবশ্য বলতে চাই না পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক সেই প্রকাশিত অভিমতটির আমি অংশীদার,[২] কিন্তু যেহেতু সেটি ঐভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে তার মধ্যে আমি এমন কিছুই পাইনি যা নাকি আমার বিবেচনায় ধর্ম অথবা রাষ্ট্রের পক্ষে অনিষ্টকর ঠেকতে পারত, তাই আমি ভাবিনি আমার নিজের মতটি লিখতে আমার দিক থেকে কোনো প্রতিবন্ধকতা জাগতে পারে, বিশেষত যদি আমারই যুক্তি আমাকে সেই দিকে প্ররোচিত করে। তবু তাতে আমার ভয় ধরল পাছে আমারও অভিমত-গুলির এমন একটি সত্যিই থাকে যাতে আমি ভুল্ করে বসেছি—যদিও পরম যত্নের সঙ্গে আমি সর্বদা খেয়াল রাখি যাতে অতি নিশ্চিত প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষা না করে কোনো নতুন মতকেই আমার প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত না করি এবং এমন কিছুই না লিখি যা কারুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে, তবু তা সত্ত্বেও পাছে কোনো ভুল কোথাও হয়ে গিয়ে থাকে! মতগুলিকে প্রকাশ করার যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তা বদল করতে আমায় বাধা করার পক্ষে ঐ ভয়টাই যথেষ্ট হল। তাছাড়া যে-যে কারণগুলি আমায় আগের সিদ্ধান্তটি নেওয়ায়, তা যদিও খুবই জোরালো ছিল, তবু বই লেখার পেশাটাকে ঘৃণা করারই ঝোঁক আমার চিরকাল ছিল বলে এবার ঐ মতগুলিকে প্রকাশ না করারও স্বপক্ষে অজস্র যুক্তি তখুনি-তখুনি বার করে ফেললাম। এবং প্রকাশ করার স্বপক্ষেই হোক বা বিপক্ষেই হোক, সে-কারণগুলি এমন যে তা এখানে বললে আমার একলারই কিছু লাভ হবে এমন নয়, হয়তো জনসাধারণেরও সেগুলি জানার সামান্যই দরকার রয়েছে।

আমার চিত্ত থেকে যা-কিছু জাগে, তাকে খুব একটা প্রাধান্য আমি কখনো দিইনি। এবং আমার এই রীতিটি খাটিয়ে একমাত্র যে-ফল আমি আহরণ করেছি, তা হল এই যে দূরকল্পিত বিজ্ঞান-বিষয়ক কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আমার তুষ্টি সাধন করতে পেরেছি বা যে-যুক্তি সেই রীতি আমায় শিখিয়েছে, তার দ্বারা আমার আচার-আচরণগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়েছি—এবং যখন এসব করেছি, তখন এই নিয়ে যে কিছু লেখার দরকার আছে, এমন আমার কখনো মনে হয়নি। ঈশ্বর কর্তৃক যারা নিয়োজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের শাসনকর্তা হিসেবে, বা যাদের তিনি যথেষ্ট গুণ ও আগ্রহে মণ্ডিত করেছেন এমনভাবে যাতে তারা মানুষের শিক্ষক হতে পারে, এদের বাদ দিয়ে যদি অন্য কাউকে দেশাচারে কিছু অদলবদল সাধনের অনুমতি দেওয়া যেত, তাহলে আচার-আচরণ সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়ে প্রতিটি মানুষই যে-যার নিজের দিক থেকে এত অজস্র রকম ধারণার অধিকারী যে মাথা গুনে যত লোক দেখা যায় পৃথিবীতে, ঠিক তত জন সংস্কারকও খুঁজে

পাওয়া যেত। এবং আমার ধারণাগুলি যদিও আমার নিজের কাছে খুবই মনঃপূত ঠেকেছিল, এটা জানতাম যে অন্যদেরও নিজের-নিজের ধ্যানধারণা এমন বহু আছে যেগুলি তাদের ভালো লাগে হয়তো আরো বেশি। কিন্তু পদার্থবিদ্যা বিষয়ে কিছু সাধারণ জ্ঞান যেই অর্জন করলাম এবং সেগুলিকে বিশেষ-বিশেষ সমস্যার সমাধানে পরখ করতে নিয়োজিত হলাম, তখন দেখলাম এই অর্জিত সামান্য জ্ঞান আরো কতদূর নিয়ে যেতে পারে, এবং এটাও বুঝলাম যে আজ পর্যন্ত যত তত্ত্বের ব্যবহার হয়ে আসছে, তার থেকে এই জ্ঞানের পার্থক্য কতখানি। তাই মনে হল এটিকে যদি এখন আমি চেপে রাখি, তবে বিষম অন্যায় না করে পারব না সেই নিয়মের প্রতি যা আমাদের প্রত্যেককে বাধ্য করে সর্বজনের সাধারণ হিতসাধনে যথাসম্ভব আসতে। কারণ এই জ্ঞানই আমায় দেখাল, এমন বহু বিদ্যার অর্জন সম্ভব যা এ-জীবনে বহু কাজে লাগে এবং বিদ্যালয়গুলিতে যা শেখানো হয়, সেই দূরকল্পিত দর্শনের বদলে এমন এক ব্যবহারিক দর্শনও খুঁজে বার করা চলে যার দ্বারা অগ্নি-জল-বায়ু-নক্ষত্র-আকাশ এবং আমাদের চারপাশের অন্যান্য সমস্ত বস্তুর বিভিন্ন শক্তি ও ক্রিয়াবলী একবার যখন খুব ভালোভাবে আলাদা-আলাদা করে জেনে নিয়েছি—অর্থাৎ ঠিক যেমনভাবে জানি আমাদের কারিগরদের প্রতিটি বিভিন্ন পেশাকে—তখন একই উপায়ে সেই শক্তি ও ক্রিয়াগুলিকে আমরা খাটাতে পারব এমন-এমন সব ক্ষেত্রে যেখানে সেগুলির ব্যবহার উপযোগী হবে, এবং এই-ভাবেই সারা প্রকৃতিটাকে আমরা বশে আনতে পারব, তার অধিকারী হব। এর মানে শুধু এই নয় যে আমরা চাইছি অসংখ্য দক্ষতার এমন একটি আবিষ্কার যার মাধ্যমে কোনো কষ্ট না করেই পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-ফলভোগ করা চলবে—কিন্তু চাইছি বিশেষ করে সেটা, সেটা স্বাস্থ্যের রক্ষাও, যে-স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই এ-জীবনের অন্যান্য সকল সম্পদের মধ্যে প্রধানতমই নয়, তাদের ভিত্তিও। কারণ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলি কখন কোন্ মেজাজ বা তবিয়তে আছে, তার উপর এত বিশেষভাবে নির্ভর করে মনেরও অবশ্যই যে যদি এমন কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব যার মাধ্যমে সর্বসাধারণে আরো জ্ঞানী ও কর্মক্ষম হতে পারে—অর্থাৎ যতটা আজো হতে পারেনি মানুষ—তো আমার তো মনে হয় সেই উপায়টিকে খুঁজতে হবে একমাত্র চিকিৎসাবিদ্যারই মধ্যে। সত্যি বলতে কি, যে-চিকিৎসা-বিদ্যাটির রেওয়াজ আজ আছে, তাতে এমন জিনিস খুবই কম যার প্রয়োজনীয়তা নজরে না পড়ে পারে না। তাকে নিন্দা করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই, তবু নিশ্চয় বলব যে এমন লোক কোথাও নেই, এমন-কি চিকিৎসা যাদের পেশা তাদের মধ্যেও নেই, যে নাকি মানবে না যে যা-কিছু মানুষ জানে সেই বিদ্যা সম্বন্ধে, তা আরো যা জানার রয়েছে সেই তুলনায় প্রায় কিছুই নয়। এটাও বলব যে যেমন শরীর তেমনি চিত্তের অসংখ্য ব্যাধি হতে রেহাই পাওয়া চলে, এমন-কি বার্ধক্যজনিত দৌর্বল্য হতেও ত্রাণ পাওয়া হয়তো সম্ভব হয়, যদি তাদের কারণ ও সকল রকম প্রতিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আমাদের থাকে—সে-প্রতিকার-গুলির আয়োজন প্রকৃতিই করে রেখেছে আমাদের জন্যে। অতএব আমার সারাটা জীবন যখন নিযুক্ত রেখেছি এমন একটি দরকারী বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে, এবং এমন একটি পথও যখন খুঁজে পেয়েছি যেটি অনুসরণ করে থাকলে মানুষে সেই লক্ষ্যে অবার্থভাবে পৌঁছোবেই বলে মনে হয়েছে—অবশ্য এক যদি স্বল্পায়ুতার দরুন বা পরীক্ষা চালানোর পদ্ধতিতে ত্রুটির দরুন সে-উদ্দেশ্যে বাধা না পড়ে—তখন এই দুটি ধরনের বাধারই শ্রেষ্ঠ প্রতিকার রূপে একমাত্র যেটি আমার বিচারে স্থান পেয়েছে, সেটি হল, প্রথমত, যত সামান্যই আমি নিজে খুঁজে বার করে থাকি না কেন, তা জনসাধারণকে অকপটে বলা; দ্বিতীয়ত, পরে

সকল সুধিজনদের নিমন্ত্রণ জানানো যাতে তাঁরা যে-যার প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুযায়ী আরো দূরে এগোতে সচেষ্ট হন, যে-সব পরীক্ষা এখনো করার আছে তাতে নিজেদের অবদান রাখেন; এবং তৃতীয়ত, এভাবে তাঁরা যা-কিছু শিক্ষা অর্জন করলেন, সেটাও সর্বজনের গোচরে আনা, যাতে পূর্বসূরিরা যেখানে থেমেছেন, উত্তরসূরিরা সেখান থেকে শুরু করতে পারেন, এবং এই উপায়ে বহু জনের বহু জীবন ও সাধনা মিলিত করে আমরাও সবাই একত্রে এগোতে পারি দূরে হতে আরো দূরে, যেটা প্রতিটি ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে করতে চাইলে কখনো পারবে না।

এমন-কি পরীক্ষার ব্যাপারে এটাও দেখেছি যে জ্ঞানের পথে যত অগ্রসর হওয়া যায়, পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা তত বাড়তে থাকে। কারণ শুরু করার পক্ষে দুর্লভ বা সুচিন্তিত-ভাবে অন্বিষ্ট কিছু থেকে একমাত্র সেই ধরনের পরীক্ষাগুলিই ভালো যেগুলি আপনা থেকে উপস্থিত হয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দরজায়, যেগুলিকে আমরা স্বীকার না করে পারি না, অবশ্য সেগুলিকে কাজে লাগানো যাবে তখনই যখন তাদের নিয়ে সামান্য হলেও অন্তত কিছুটা চিন্তা করতে পেরেছি। এর কারণটা হল এই যে ঐ দুর্লভ ধরনের পরীক্ষাগুলি প্রায়ই চোখে ধুলো দেয় যদি তাদের সাধারণতম কারণগুলি তখনো কারুর কাছে পরিচিত না হয়ে থাকে, এবং যেহেতু যে-যে পরিস্থিতির উপর তারা নির্ভরশীল হয়, সে-পরিস্থিতি-গুলি প্রায় সব সময়ই অতি বিশিষ্ট ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তাই তাদের লক্ষ্য করতে পারাও বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যে-ক্রম আমি অনুসরণ করেছি এখানে, তা হল এইরকম : প্রথমত, সাধারণভাবে যা খোঁজার চেষ্টা করেছি, তা হল যা-কিছু আছে বা থাকতে পারে এই পৃথিবীতে, তার সবেরই তত্ত্বসমূহ বা প্রাথমিক কারণগুলি কী—এবং সেটা করতে গিয়ে আমার বিবেচনায় যে-কথা সর্বক্ষণ ছিল, তা হল এই পৃথিবী একমাত্র ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। এবং সেই কারণগুলির ক্ষেত্রেও, তাদের খুঁজতে চেয়েছি অন্যত্র নয়, বরং সত্যের সেই এমন-কিছু বীজেরই মধ্যে যা আমাদের আত্মায় স্বভাবতই নিহিত। এর পরে আমি বিবেচনা করতে বসেছি সেই কারণগুলি হতে কোন্-কোন্ প্রাথমিক ও অতি-সাধারণ কার্য অনুমান করা চলে; এবং সেটা করতে গিয়ে মনে হল, এবার আমি যেন খুঁজে পাচ্ছি অনেক আকাশ ও নক্ষত্র, একটি পৃথিবী, এমন-কি পৃথিবীরও উপরে আলো-বাতাস-অগ্নি-খনিজ ইত্যাদি নানান এমন পদার্থও যারা অন্য যে-কোনো পদার্থ থেকে শুধু যে সরলতরই বা যাদের সর্বত্র যে আরো অনেক বেশি দেখাই যায় তা নয়, সে-কারণে তাদের জানাও আরো সহজ। পরে যখন নামতে চাইলাম বিশেষ-বিশেষ পদার্থের ক্ষেত্রে, তখন এত রকমের বিভিন্ন জিনিস একসঙ্গে আমার সামনে উপস্থিত হল যে পৃথিবী-স্থিত এক ধরনের বস্তুসমূহের আকার বা প্রকারকে অন্য ধরনের অসংখ্য সম্ভাব্য বস্তুর থেকে পৃথক করে দেখা মনুষ্যবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব বলে মনে হল না—বিশেষত তেমন অসংখ্য বস্তু যখন খুবই থাকতে পারে, যদি ঈশ্বর পৃথিবীর উপর তাদের সেভাবে বসাতে চেয়েছেনই। তাই যেসব বস্তুকে কী করে আমাদের ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাও ভেবে পেলাম না—শুধু এ-ক্ষেত্রে করা যায় যেটা, তা কার্য থেকে কারণের সামনে আসা ও বিশেষ প্রকারের বহু পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া[৩]। এর পরে যখন মনটাকে ভালো করে আবার ঘুরিয়ে আনলাম যাবতীয় সেই সব বিষয়ের উপর দিয়ে যা হয়তো মাত্র একবারের জন্যে হলেও কখনো হাজির হয়েছে আমার ইন্দ্রিয়ের সামনে, বলতে বাধা হচ্ছি যে তখন তার মধ্যে এমন কিছুই পেলাম না যাকে আমার প্রাপ্ত তত্ত্বগুলির দ্বারা সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করতে আমি পারব

না। অবশ্য এটাও স্বীকার করব যে প্রকৃতির শক্তি এত বিরাট ও সে-শক্তির পরিমাণ এত প্রচুর, এবং আমার ঐ তত্ত্বগুলিও এত সরল ও এত সাধারণ, যে প্রায় এমন কোনো বিশেষ কার্য বা ফলই আমি দেখছি না যাকে নাকি বহু বিভিন্ন প্রকারে অনুমেয় বলে আগে থেকেই জানি না—কিন্তু সাধারণত সবচেয়ে বড় সমস্যা যা জাগে এখানে আমার, তা সেই কার্য বা ফলটি অতগুলি বিভিন্ন প্রকারের ঠিক কোন্‌টির উপর নির্ভর করছে সেটা খুঁজে পাওয়া। এবং সেটা পেতে গেলে একমাত্র যে-উপায়টির কথা আমি জানি, তা হল ফিরে-ফিরে অনুসন্ধান চালানো এমন কতকগুলি পরীক্ষায় যেগুলিকে আমার ব্যাখ্যার জন্য যে-প্রকারে ঘটাতে চাই, সে-প্রকারে ঘটালে যা ঘটবে, অন্য প্রকারে ঘটালে তা ঘটবে না। তাছাড়া, যে-পর্যায়ে আমি এখন পেঁচৌছি, মনে হয় সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঠিক কোন্ উপায় অবলম্বন করলে উক্ত পরীক্ষাগুলির অধিকাংশতেই ঈপ্সিত ফলটি মিলবে। কিন্তু এটা দেখছি যে যত পরীক্ষা করার রয়েছে, তা এমন প্রকৃতির ও সংখ্যায় এত অজস্র যে যে-অর্থ বা সামর্থ্য আমার আছে, তার হাজারগুণ বেশি থাকলেও আমার পক্ষে সব পরীক্ষা শেষ করার জন্য যথেষ্ট হত না। ব্যাপারটা তাই এমন যে এখন থেকে যত বেশি বা যত কম পরীক্ষা করার সুবিধা আমার থাকবে, সেই অনুযায়ী প্রকৃতির বিষয়ে জ্ঞানার্জনে আমিও তত বেশি বা তত কম এগোব। এবং ঠিক এই প্রতিশ্রুতির কথাই আমার লিখিত সেই নিবন্ধে আমি জানাতে চাই, এবং তাতে জনসাধারণের কী সুবিধা হবে, সেটাও সেখানে অতি পরিষ্কার করে দেখাই যাতে যে-কেউ সাধারণভাবে মানুষের ভালো চায়, অর্থাৎ সেই সকল ব্যক্তি যাদের যথার্থ ধার্মিক বলা চলে ও যারা শুধু মত জাহির করে বা ভান দেখিয়েই মানুষের কল্যাণকামী হয় না, তারা প্রত্যেকেই যেন বাধ্য করে একদিকে যেমন আমাকে জানাতে যে-যে পরীক্ষা তারা ইতিমধ্যেই নিজেরা করেছে, অন্যদিকে তেমনি যে-যে পরীক্ষা এখনো বাকি আছে, তার অন্বেষণে আমাকে সাহায্য করতে।

কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যান্য কারণ কিছু ঘটেছে যার ফলে আমি আমার আগের মত বদলেছি। এখন ভাবছি, আমার আসলে সমানে লিখে চলা উচিত তেমন সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে যাদের আমি মূল্য দিই ততখানিই, যতখানি তাদের মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কার করতে পারব বলে মনে করি। এবং সেগুলি নিয়ে লেখার সময় ততটা যত্নই নেব যতটা নাকি নিতাম যদি লেখাটাকে ছাপাতে চাইতাম। এটা করার উদ্দেশ্য হল একদিকে যেমন লেখাটাকে বার-বার ভালোভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া, ঠিক যেমন মানুষে সে-জিনিসটায় সর্বদাই আরো কাছ থেকে ও আরো গভীর নজর দেয় যেটাকে সে শুধু নিজের জন্যে না করে অন্য অনেককে দেখানোর জন্যে করে (এবং প্রায়ই এমন সব জিনিস যা সত্য বলে ঠেকেছিল যখন শুরুতে তাদের সম্বন্ধে ধারণা জাগে মনে, সেই একই জিনিসের সারি পরে আমার কাছে মিথ্যা বলে ঠেকেছে যখনই তাদের নিয়ে কিছু লিখতে বসতে চেয়েছি)—এ-কাজ করার তেমনি অন্য উদ্দেশ্য হল এমন কোনো অবকাশই না হারানো যার দ্বারা জনসাধারণের উপকারে যথাসাধ্য আসতে পারি। এই উদ্দেশ্যের পিছনে যা রয়েছে, তা আমার রচনার যদি কোনো মূল্য থাকে তো আমার মৃত্যুর পরে যাদের হাতে সেটা যাবে, তারা যেন নিজেদের সুবিধামতো তার সদ্ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যেটায় রাজী হওয়া আমার কিছুতে চলবে না, সেটা হল আমার জীবদ্দশায় এই রচনাগুলি প্রকাশ করা—কারণ এদের কেন্দ্র করে যে-বিরোধিতা ও বাদানুবাদ জাগতে পারে, বা এদের কারণে যে-সুনাম আমি অর্জন করতে পারি, তার কোনো-কিছুরই জন্য আমার সময় এতটুকু

নষ্ট হোক সেটা বরদাস্ত আমি করব না। আমার সমস্ত সময়কে নিয়োজিত করব একমাত্র আত্মশিক্ষণেই, এই আমার অভিপ্রায়। কারণ, এটা যেমন সত্য যে প্রতিটি মানুষেরই উচিত সাধ্যমতো অন্যের সেবায় আসা এবং সে-জীবন সত্যিই ব্যর্থ যা অন্যের কোনো কাজে লাগল না, ঠিক তেমনি সত্য হল এই কথাও যে আমাদের সকল আগ্রহকে নিছক বর্তমান ছাড়িয়ে আরো দূর ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত হতেই হবে, এবং লক্ষ্য যদি হয় আমাদের কাজের দ্বারা আমাদের বংশধরদের আরো উপকৃত করা, তাহলে সেই একই কাজের দ্বারা কোনো সম্ভাব্য উপকার হতে আমাদের সমসাময়িকদের বঞ্চিত করাটা দোষের ঠেকবে না। এখানে এটা লোককে বলতে পারলে আমি সুখী হব যে সেটুকু জেনেছি আজ পর্যন্ত, তা এখনো যা জানার রয়েছে তার তুলনায় প্রায় কিছুই নয়—এবং বুঝতে যে পারব, সে-ভরসা রাখি বলেই আমি হাল ছেড়ে দেব না। কারণ নানান বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যের সন্ধান যারা একটু করে পেতে-পেতে এগোচ্ছে, তাদের অবস্থাটা খানিকটা সেই লোকদের মতো যারা বেশ ধনী ইতিমধ্যেই হতে পেরেছে বলে আরো বড়-বড় ধন আহরণ করে চলে সহজেই—আগে যখন গরিব ছিল, তখন এর থেকে অনেক ক্ষুদ্রতর ধন আহরণেও তাদের আরো বেশি বেগ পেতে হয়েছে। অথবা, তুলনা পাড়া চলে সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গেও, যারা যুদ্ধে যত জয়ী হয়, সেই অনুপাতে প্রথামতো তাদের সৈন্যসামন্তও তত বাড়তে থাকে, কিন্তু একবার যদি হারে যুদ্ধে তো তখন আগের চাল বজায় রাখতে তাদের যে-বিশেষ মুনশীয়ানার দরকার পড়ে, তা যুদ্ধজয়ের পরে একের পর এক শহর ও রাজ্য দখল করার দক্ষতা থেকে আরো বেশি। কারণ সত্যের জ্ঞানার্জনের পথে যত বাধা-বিঘ্ন-ভ্রান্তি জাগে, তাদের জয় করার চেষ্টা যথার্থ যুদ্ধে নামারই শামিল। এবং খানিকটা সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা জন্মানো মানেই সেরকম একটি যুদ্ধে হার স্বীকার করা। এর পরে যে-নৈপুণ্যের দরকার পড়ে, তা তুলনামূলক ভাবে আরো অনেক বেশি সেই মানুষের নৈপুণ্য হতে যে আগে থেকেই বহু নিশ্চিন্ত তত্ত্বে সম্পন্ন হয়ে বিরাট অগ্রগতির পথে যেতে চাইছে সতর্কতার সঙ্গে। যদি নিজে আমি নানান বিজ্ঞানের মধ্যে কিছু-কিছু সত্যের সন্ধান ইতিমধ্যে পেয়ে থাকি (এবং যে-যে বিষয় বিধৃত রইল এই গ্রন্থে, তার দ্বারাও আশা করি লোকে বিচার করতে পারবে যে কিছু সত্যের সন্ধান আমি বাস্তবিকই পেয়েছি), তবে এটাও বলব যে তা হচ্ছে পরবর্তী ঘটনা ও পরিণাম এমন পাঁচটি কি ছটি প্রধান-প্রধান বাধার যাদের সম্মুখীন আমাকে হতে হয় এবং যাদের অতিক্রমও আমি করেছি—এবং এই বাধাগুলিকে আমি গুনেছি ঠিক সমানসংখ্যক যুদ্ধ হিসেবে, যে-যুদ্ধে ভাগ্য আমার সহায় হয়। এমন-কি আরো মাত্র গোটা দুই-তিন অনুরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলেই পেঁছে যাব আমার সকল লক্ষ্যের শেষ বিন্দুটিতে, এটা আমি ভাবি ও তা বলতে পিছপাও আমি নই। এবং প্রকৃতির সাধারণ গতি অনুযায়ী এমন কিছু বয়সও আমার হয়েছে বলে তো মনে হয় না যাতে সে-লক্ষ্যে সত্যি-সত্যিই পেঁছানোর মতো যথেষ্ট অবকাশ আমার না থাকার আশঙ্কা জাগতে পারে। কিন্তু যেহেতু বেশ আশা রাখি যে আমার হাতে এখনো যেটুকু সময় আছে তা উচিতভাবে খাটাতে পারব, তাই সে-সময়ের এতটুকুও যাতে অপচয় না করি তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রেখে আমার উপায় নেই। এবং পদার্থবিদ্যার ভিত্তিসমূহ সংক্রান্ত আমার মতামতগুলি যদি প্রকাশ করতে যাই তো আমার সেই মহামূল্য সময় নষ্ট করার যে বহু অবকাশ আমি নিজেকে দেব, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ যদিও সেই মতামতগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই এত স্বতঃসিদ্ধ যে সেগুলি কানে শোনা মানেই বিশ্বাস

করা এবং যদিও সেগুলির মধ্যে এমন একটি মতও নেই যার যথাযোগ্য প্রমাণ দিতে পারব বলে আমি মনে না করতে পারি, তবু অন্যান্যদের যাবতীয় বহুবিধ মতামতের সঙ্গে তাদের মিল খাওয়াটা যেহেতু অসম্ভব, আমি তাই আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে, এগুলি প্রকাশ করলে যে-নানান বিরোধিতা জন্ম নেবেই, তা আমায় প্রায়ই বিব্রত করবে।

বলা অবশ্য চলে যে এ-ধরনের বিরোধিতার দরকার আছে, কারণ তা একদিকে যেমন আমায় আমার দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দেবে, অন্যদিকে তেমনি আমার মতগুলিকে এখনই ব্যবহার করতে শুরু করে সেই বিরোধীরা নিজেরাও কী খুঁজে পেয়েছে-না-পেয়েছে সেটা জানিয়ে আমায় সাহায্য করবে, বিশেষত যেহেতু আমার যদি কিছু ভালো থেকে থাকে তো সেই একই যুক্তিতে অন্যদেরও বেশি বুদ্ধি খুবই থাকতে পারে ও একটা মানুষে যা দেখে বা দেখতে পায় তার থেকে বেশি দেখা যায় অনেকে মিলে দেখলে। কিন্তু, যদিও ভুল আমি খুবই করতে পারি বলে জানি এবং যদিও প্রথমে যত চিন্তা আসে আমার মনে তাদের উপর আস্থা প্রায় কখনোই রাখি না, তবু যে-ধরনের আপত্তি আমার মতগুলি নিয়ে তোলা সম্ভব, তার সবগুলিকেই আগে থেকে বিচার করে দেখেছি বলেই এটাও জানি যে ওসব আপত্তি থেকে আমার কোনো লাভ হওয়ার নেই। কারণ যাদের বন্ধু বলে মানি শুধু তারাই নয়, বা যাদের নিরপেক্ষ মনে করি শুধু তারাও নয়, এমন-কি সেই অন্য কয়েকজনও যাদের আমার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ জানি স্বভাবতই খুঁড়ে বার করার যথেষ্ট চেষ্টা করবে এমন সব জিনিস যা আমার বন্ধুরা হলে আমার প্রতি স্নেহবশত দেখতেই পেত না, এদের প্রত্যেকেরই মতামত আমি ইতিমধ্যে প্রায়ই বিচার করে দেখেছি। আমার সম্বন্ধে কেউ এমন একটা আপত্তি তুলল যার কথা আমি আগে একেবারেই ভেবে দেখিনি, এ-ধরনের ঘটনা কদাচিৎই ঘটেছে—অবশ্য এক যদি সে-আপত্তি ঠিক আমার বিষয় সংক্রান্ত না হয়ে হয় অনেক দূরের কিছু নিয়ে তো অন্য কথা—তাই আজ পর্যন্ত এমন লোকের সাক্ষাৎ প্রায় কখনো পাইনি যে আমার মতের বিরোধিতা করছে, অথচ সেই মত সম্বন্ধে যাকে আমার মনে হয়েছে ঠিক ততটা কঠোর বা ততটা পক্ষপাতশূন্যই যতটা নাকি আমি নিজেই হয়েছি। এবং এটাও আমার নজরে পড়েনি যে যে-ধরনের তর্ক-বিতর্কের চলন আছে আমাদের শিক্ষার স্থানগুলিতে, তার মাধ্যমে কেউ কখনো সন্ধান পেল এমন কোনো সত্যের যার কথা আগে জানা ছিল না। কারণ তর্কের মাধ্যমে যখন একজন আরেকজনকে হারাবার চেষ্টা করছে, তখন বেশি আগ্রহটা ততটা যুক্তির নিষ্কিতে উভয়ের বক্তব্যের বিচার নয় যতটা কোনো রকমে একটা সম্ভাব্যতা বার করে দেখানো—এবং যারা বহুকাল মোক্তারি করে সুনাম কিনেছে, তারাই যে সেই কারণে পরে শ্রেষ্ঠ বিচারক হবে, এমন কথা নেই[৪]।

যদি প্রশ্ন করা যায় আমার চিন্তাগুলি জানলে পরের কী উপকার হবে তো বলতে হয় সে-উপকার হয়তো ততটা বড় কিছু হবে না, বিশেষত যেহেতু সে-চিন্তাগুলিকে আমি খুব বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারিনি ও তাই সর্বজনের ব্যবহারের পক্ষে তাদের উপযোগী করে তুলতে গেলে আরো অনেক কিছু যোগ করার দরকার সেখানে রয়েছে। এবং তা যোগ করার সামর্থ্য যদি কারুর থাকে তো সে-ব্যক্তি অন্য কেউ না হয়ে বরং আমিই হব, দেমাক না করে এ-কথা বলতে পারি বলে মনে করি। এর অর্থ এই নয় যে পৃথিবীতে এমন বহু লোক থাকতে পারেন না যাঁরা চিত্তগুণে আমার থেকে অতুলনীয়ভাবে মহত্তর—শুধু বলতে চাইছি যা, তা হল যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তি কোনো বিশেষ জিনিসের আবিষ্কর্তা, তখন সেই জিনিস সম্বন্ধে তার যতখানি ধারণা থাকতে পারে এবং সেই জিনিসকে নিজের করে

নিতে তার যতটা ক্ষমতা থাকবে, ততটা অন্যের কিছুতেই থাকবে না, বিশেষত যখন সেই অন্য ব্যক্তি জিনিসটা শিখেছে অপর এক তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে। কথাটা এত সত্যি যে দৃষ্টান্ত হিসেবে বলি, যদিও আমার কয়েকটি অভিমত প্রায়ই বুঝিয়েছি বেশ বুদ্ধিমান কিছু-কিছু ব্যক্তিকে, এবং যখন তাঁদের সঙ্গে কথা বলি, তখন যদিও মনে হয় তাঁরা সব বুঝছেন অতি পরিষ্কারভাবে, তবু পরে যখন তাঁরা নিজেরাই সেটার পুনরাবৃত্তি করতে গেছেন, তখন প্রায় সর্বদাই দেখেছি আমার মতগুলো এমন এক পরিবর্তিত আকার নিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে যে আমার বলে তাদের আর চিনতে পর্যন্ত পারি না। তাই এই সুযোগে আমাদের বংশধরদের একটি অনুরোধ জানিয়ে রাখি নির্দ্বিধায় : লোকের মুখে শুনে তারা যেন কখনো বিশ্বাস না করতে যায় যে কোনো বিশেষ মত বা জিনিস এসেছে আমার কাছ থেকে, যদিও আসলে আমি নিজে হয়তো সেটিকে একেবারেই প্রকাশ বা প্রচার করিনি। একেবারেই চমকাই না তাই যখন দেখি যাঁদের কোনো লেখাই আজ খুঁজে পাওয়া যায় না, আমাদের প্রাচীন সেই সব দার্শনিকদের নামে কত অদ্ভুত কথাই না চালানো হয়। কিন্তু তার মানেই যে তাঁদের চিন্তা-ধারণা খুব অযৌক্তিক ছিল, এমন বিচার করতে বসি না, বিশেষত যখন জানি তাঁরা ছিলেন তাঁদের কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী—শুধু যা হয়েছে এক্ষেত্রে, তা তাঁদের চিন্তা-ধারণার ভুল ব্যাখ্যা লোকে আমাদের কাছে করেছে। তাই দেখা যায় তাঁদের গোষ্ঠীভুক্তদের একজনও তাঁদের অন্তত্রম করে গেল, এমন প্রায় কখনো ঘটেনি। এবং এটা আমি নিশ্চিত জানি যে আজ যারা অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর সবচেয়ে বড় ধ্বজাধারী, তারা বর্তে যেত যদি প্রকৃতি সম্বন্ধে যতখানি জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন, তার সবটার অধিকারী তারা হতে পারত, এমন-কি সেই শর্তও যদি থাকত এক্ষেত্রে যে তিনি যা জেনে-ছিলেন তার এতটুকু বেশি তারা কখনো জানবে না। এরা ঠিক আইভি-লতার মতো, তাই যে-গাছকে আশ্রয় করে তারা আছে, তার চেয়ে আরো উপরে ওঠার প্রবণতা তাদের থাকে না, বরং প্রায়ই শীর্ষ পর্যন্ত উঠেই তারা তলার দিকে নামতে থাকে। এবং এটাও আমার মনে হয় যে এরা যে নামছে এভাবে, অর্থাৎ পড়াশুনো ছেড়ে দিলে যতখানি না হত তার চেয়ে কম পণ্ডিত নিজেদের করে তুলছে কোনো-কোনো প্রকারে, তার কারণ হল এই যে যা-কিছু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে গেছেন তাঁদের গুরু, তাতে সন্তুষ্ট না থেকে সেই গুরুর মধ্যে তারা এমন সব সমস্যারও সমাধান খোঁজে যে-বিষয়ে গুরু স্বয়ং নীরব তো থেকেছেনই, হয়তো সে-বিষয়ে কখনো চিন্তাও করেননি তিনি। তবে এদের দার্শনিকতা করার ধরনটা একমাত্র তাদেরই পক্ষে বিশেষ উপযোগী যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নিতান্তই সামান্য—কারণ কি তাদের বাছবিচারের পদ্ধতি কি তাদের ব্যবহৃত তত্ত্বসমূহ, উভয়েরই দুর্বোধ্যতা এমন যে তার ফলে তারা যাবতীয় বিষয় নিয়ে নির্ভয়ে কথা বলতে পারে; ভাবখানা যেন যা নিয়ে বলছে তার সব কিছু সত্যিই জেনে বসে আছে। ঐ একই দুর্বোধ্যতার দরুন যা-কিছু বলছে, তাকে তারা ঠিক দাঁড় করিয়ে রাখে সূক্ষ্মতম ও দক্ষতম যুক্তির বিরুদ্ধেও, এবং এমন কোনো উপায়ই নেই যার দ্বারা তাদের বোঝানো চলে—যে কারণে এদের আমার মনে হয় সেই অন্ধের মতো যে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তার লড়াই-এ যাতে অসুবিধায় না পড়ে, সেই ব্যক্তিকে তাই ডেকে আনে অন্ধকার কোনো গুহার গহন কোণে। এবং এটা বলতে পারি যে দর্শনের যে-তত্ত্বগুলি আমি ব্যবহার করছি, সেগুলি যদি প্রকাশ করা হতে বিরত থাকি তো তা এই লোকদের স্বার্থের অনুকূলই হবে, কারণ আমার সে-তত্ত্বগুলি অতি সহজ ও অতি স্বতঃসিদ্ধ বলেই তাদের প্রকাশ করার

অর্থটা হবে অনেকটা ঐ যে-অন্ধকার গুহায় ওরা নেমেছে যুদ্ধ করতে, সেখানে আমার কতকগুলো জানলা খুলে দিয়ে দিনের আলো ঢোকানো। এমন-কি ওদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ মনস্বী, তাদের পক্ষেও আমার সেই তত্ত্বগুলিকে জানার স্পৃহা থাকার কথা নয়, কারণ তাদের উদ্দেশ্য যদি হয় সব বিষয়ে কথা বলতে জানার ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের সুনাম অর্জন তো যে-সম্ভাব্যতা খুব কষ্ট না করে খুঁজে পাওয়া চলে সকল রকম বস্তুর মধ্যে, তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই তাদের সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে আরো সহজে। এর চেয়ে সত্যের পিছনে ছোটা আরো কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তা ছাড়া সত্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব একটু-একটু করে কোনো-কোনো বস্তুতে—এবং যখন প্রশ্ন ওঠে আর-সব বস্তু নিয়ে, তখন খোলাখুলি স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে সে-সব বস্তুর সত্যাসত্য সম্বন্ধে মানুষ এখনো কিছুই জানে না। কিন্তু সবজান্তার ভান করা থেকে তারা যদি পছন্দ করে সত্যেরই জ্ঞানার্জন, তবে তার জন্য যা আমি ইতিমধ্যেই বলেছি এই আলোচনায়, তার বেশি আরো কিছু তাদের বলার দরকারই পড়বে না। কারণ যেটুকু পথ আমি এসেছি, সেটা ছাড়িয়ে আরো দূর যেতে যদি তারা সক্ষম হয় তো একই যুক্তিতে যা-কিছু খুঁজে পেয়েছি বলে আমি ভেবেছি, সেটাও নিজেরাই খুঁজে পেতে তারা সমানই সক্ষম হবে। বিশেষত যেহেতু একমাত্র ক্রম অনুযায়ীই প্রতিটি জিনিসের পরীক্ষা আজ পর্যন্ত করেছি, তাই এখনো যা আবিষ্কার করার রয়েছে আমার পক্ষে, তা যা-কিছুর সাক্ষাৎ পেতে পেরেছি ইতিমধ্যে, তার থেকে নিশ্চয় দুরূহ ও আরো গূঢ়ত হবেই—এবং সে-সম্বন্ধে যদি ঐ সাধকরা জ্ঞানার্জন করতে পারে নিজেদেরই চেষ্টার মাধ্যমে তো সেটা স্বভাবতই তাদের পক্ষে আরো আনন্দের হবে, আমার থেকে ঐ ব্যাপারে শিক্ষা পাওয়া হতে। তা ছাড়া আগে সহজ-সহজ জিনিস ও ধাঁরে ধাঁরে তার থেকে পর্ব অনুযায়ী আরো শক্ত জিনিসে ক্রমাগত চলে যাওয়ার অভ্যাসটাকেও তারা আয়ত্ত করবে, এবং সেই অভ্যাসটা তাদের যে-সাহায্য আসবে, আমার হাজার নির্দেশ-উপদেশে তা আসবে না। যেমন আমার ক্ষেত্রে এ-কথা আমি নিজেকে বলে থাকি যে যদি অতি অল্প বয়সেই কারুর কাছে শিখে ফেলতাম এমন সব সত্যগুলি যার প্রমাণ আমি তখন থেকে খুঁজে বেড়িয়েছি এবং তাদের তাই জেনে ফেলতে যদি কোনো কষ্টই আমার না হত, তাহলে হয়তো অন্য কোনো সত্যের কথাই আমি কখনো জেনে উঠতাম না, অন্তত অনুসন্ধানে রত থাকার ফলে ক্রমাগতই নতুন-নতুন সত্য আবিষ্কারের যে-অভ্যাস ও দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছি বলে মনে করি, সেটা তখন কিছুতেই সম্ভব হত না। এক কথায় যদি পৃথিবীতে এমন কোনো কর্ম থাকে যা যে-ব্যক্তি সেটি প্রথমে শুরু করে, সে ভিন্ন অন্য কারুর দ্বারাই ততটা ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে না তো সে-কর্ম হল সেইটিই যাতে আমি এখন লেগে আছি।

এটা সত্য যে সে-লক্ষ্যে পৌঁছোতে গেলে যত পরীক্ষা করার দরকার, কোনো একলা মানুষের পক্ষে তার সবগুলি করা সম্ভব নয়। অন্য দিকে সে-মানুষ ঐ একই কাজে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়োজিতও করতে পারে না, অবশ্য এক যা পারে, তা সম্ভব হলে কিছু নিপুণ শ্রমিককে লাগানো, অথবা এমন কিছু লোক যাদের সে পয়সা দিয়ে খাটাতে পারবে —এবং কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার পক্ষে তাকে লাভের আশা দেখানো যেহেতু একটি অতীব ফলপ্রসূ উপায়, এরাও তখন তাই লাভের আশায় সে-লোকটি যেমন-যেমন নির্দেশ দেবে, তার সবগুলিই তেমনি ঠিক-ঠিকভাবে পালন করবে। কারণ, হয় কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে নয়তো শেখার বাসনা নিয়ে যারা হয়তো স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে পারে সেই একলা

মানুষকে সাহায্য করতে, প্রথমত তারা যতটা প্রতিশ্রুতি সাধারণত দেয় ততটা ফল দেখায় না—এবং তারা জানে শুধু একটার পর একটা এমন চমৎকার প্রস্তাব পেড়ে যেতে যার কোনোটাই কখনো সফল হতে পারে না—তা ছাড়া যেভাবে তারা চাইবেই পুরস্কৃত হতে, তা হচ্ছে শক্ত-শক্ত সমস্যা ব্যাখ্যা করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হোক, বা অন্তত কিছু প্রশংসাসূচক কথা তাদের শোনানো হোক, কিম্বা তাদের সঙ্গে কিছু অনর্থক আলাপ-আলোচনা করা হোক। এবং এটা যদি মেনে নেয় সেই একলা মানুষ তো তাদের সঙ্গে সে যতটুকু সময়ই অতিবাহিত করুক না কেন, সে ধরে নিতে পারে সে-সময়টুকু তার সম্পূর্ণ নষ্ট হল। এবং যে-সব পরীক্ষা অন্যানোরা ইতিমধ্যেই করে গেছে, তাদের সম্বন্ধে ঐ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা ব্যক্তিরা যদি তাকে সত্যিই কিছু জানাতেও চায়—যেটা যারা এ-ধরনের পরীক্ষাকে গোপন বলে অভিহিত করে, তারা কখনো করবে না—তাহলেও সেই পরীক্ষাগুলি বহুলাংশে অবিচ্ছেদ্য এত রকমের পরিস্থিতির সঙ্গে এবং তাদের অনেকখানি গঠিত এত অনাবশ্যক উপাদানে যে তার থেকে সত্যকে খুঁজে বার করা তখন মানুষটির পক্ষে রীতিমতো দুষ্কর হয়ে উঠবে। তাছাড়া যারা পরীক্ষাগুলি করে, তারা যেহেতু সে-গুলিকে তাদের নিজেদের তত্ত্বসমূহের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি, তাই পরীক্ষাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই আমাদের ঐ মানুষটির কাছে ঠেকবে এত খারাপভাবে ব্যাখ্যাত বা এত ভ্রান্ত পর্যন্ত যে যদি তাদের মধ্যে এমন দুয়েকটি পরীক্ষাও থাকে যা তার কাজে আসতে পারত, সেই-সেই পরীক্ষাটি বেছে নেওয়ার মতো সময় তার থাকত না, সে-সময়টা নষ্ট করা সে সমীচীনও মনে করত না। অর্থাৎ যা দাঁড়াচ্ছে তা হল এই যে যদি পৃথিবীতে এমন একটি লোক পাওয়া যায় যে সর্বজনের জন্যে সবচেয়ে আশ্চর্য-কর ও সবচেয়ে কল্যাণকর যা-কিছু জিনিস হতে পারে তা খুঁজে বার করতে নিঃসন্দেহে সক্ষম এবং সেই কারণে তার অভীষ্ট সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হোক এটা চেয়ে অন্যেরা তাকে সর্ব রকমে সাহায্য করতে সচেষ্ট হয়, তবে সে-ক্ষেত্রে আমার তো মনে হয় একমাত্র যে-উপায়ে সেই অন্যেরা তাকে সাহায্য করতে পারে, তা হল তার পরীক্ষার আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করা[৩] এবং দেখা যাতে সে কাজ করার অবকাশ পায়, যাতে সেই অবকাশে কেউ-ই তাকে বিরক্ত করতে না আসে। অসাধারণ কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিতে চাইব, এমন ধৃষ্টতা আমার অবশ্য নেই; যা-কিছু আমি করতে চাইছি তাতে সর্বসাধারণের[৪] অতীব আগ্রহ দেখানো উচিত, এমন কল্পনা করার মতো দাম্ভিক মনোবৃত্তিতেও আমি আত্মতুষ্টি খুঁজি না; তবু বলবই, এত হীনও আমার চিত্ত নয় যে সে কারুর কাছ থেকে গ্রহণ করতে চাইবে এমন একটা অনুগ্রহ যেটার যোগ্য বলে আমাকে লোকে মনে করে না।

এইসব নানান দিক একত্রে বিবেচনা করে আজ থেকে তিন বছর আগে মনস্থ করলাম যে-নিবন্ধটিতে হাত দিয়েছি সেটি আর প্রকাশ করব না—শুধু তাই নয়, সিদ্ধান্ত নিলাম আমার জীবনকালে এমন অন্য কোনো নিবন্ধও প্রকাশ না করার যার প্রকৃতি নাকি আমার আগের নিবন্ধটির মতোই বিশদ বলে ঠেকতে পারে এবং যার থেকে নাকি পদার্থবিদ্যার ভিত্তিসমূহ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটাকে লোকে ধরতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন করে আরো দুটি কারণ ঘটেছে যার ফলে বাধ্য বোধ করছি এখানে দুয়েকটি বিশেষ-বিশেষ প্রবন্ধ উপস্থাপিত করতে এবং তদ্দ্বারা আমার কর্ম ও অভিপ্রায়ের কিছু হদিস জনসাধারণকে দিতে। কারণ দুটির প্রথমটি হল এই যে যদি এটা না করি তো তখন অনেকে যারা আমার আগের সংকল্পটির কথা জেনেছিল—অর্থাৎ আমার কিছু-কিছু রচনা ছাপাবার সেই সং-

কল্পটি—তারা হয়তো ভাবতে পারে, সেগুলি প্রকাশ করলে অসুবিধায় পড়তে পারি বলেই ছাপানো থেকে নিবৃত্ত আমি রইলাম, এবং সে-ক্ষেত্রে যে-অসুবিধায় আমি পড়তে পারি, সেটাকেও হয়তো তারা বাড়িয়ে দেখবে। কারণ যদিও অতিরিক্ত খ্যাতির অভিলাষী আমি নই—বরং বলতে পারি সেরকম খ্যাতিকে আমি ঘৃণাই করি, যেহেতু যে-মানসিক শান্তি আমার সব থেকে বেশি কাম্য, সেই খ্যাতিকে তার পরিপন্থী বলেই বিচার করি—তবু কোনো পাপকর্মের মতো লুকিয়ে-চুরিয়ে কাজ করার চেষ্টা যেমন আমি কখনো করিনি, তেমনি নিজেকে অজ্ঞাত রাখতেও অতিরিক্ত সাবধানতা কখনো অবলম্বন করিনি; সেটা করলে নিজের প্রতি অন্যায় করতাম বলেই মনে করি, এবং তখন এমন একটা অস্থিরতায় আমাকে ভুগতে হতই যে যে-সম্পূর্ণ মানসিক শান্তি আমি খুঁজে বেড়িয়েছি, সেটা পুনরায় তার বিরুদ্ধে যেত। এবং পরিচিত হতে চেষ্টা করা বা না-করার ব্যাপারে আমি যেহেতু চির-কালই উদাসীন থেকেছি এবং তাই যে-একধরনের নাম অর্জন করে বসে আছি সেটা ঠেকাতে পারিনি, অতএব সে-নামটা যাতে অন্তত দুর্নাম না হয়ে ওঠে তার দিকে যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখা আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি। অন্য যে-কারণটি আমায় এ-গ্রন্থ লিখতে বাধ্য করেছে, সেটি হল এই যে যখন ভাবি এখনো কত অজস্র পরীক্ষার আবশ্যকতা আমার রয়েছে এবং তার ফলে নিজেকে শিক্ষা দেওয়ার যে-পরিকল্পনা আমি নিয়েছি তাতে উত্তরোত্তর কী পীড়াদায়ক বিলম্ব ঘটছে প্রতিদিন, এবং এটাও যখন দেখি যে পরের সাহায্য বিনা আমার এগোনো অসম্ভব—যদিও আমার যাবতীয় ব্যাপারে জনসাধারণ একটি বিরাট আগ্রহ নেবে, সেরকম কোনো আশায় আনন্দ আমি খুঁজছি না—তখন আমার কর্তব্যে এমন অবহেলা যেন না করি যাতে আমি চলে গেলেও যারা থাকবে তারা এই বলে একদিন আমায় দোষ দেয় যে আমি যা তাদের দিয়ে গেলাম, তার চেয়ে অনেক ভালো জিনিস দিয়ে যেতে পারতাম; এবং সে-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার পরিকল্পনাগুলিকে কোন্ উপায়ে তারা সাহায্য করতে পারে, সেগুলিতে তাদের নিজেদের অবদানও রাখতে পারে, তা আমার দিক থেকে তাদের পরিষ্কারভাবে জানাতে এতটুকু ত্রুটি হতে চলবে না।

এবং এটাও মনে হয়েছে যে আমার পক্ষে এমন কিছু-কিছু বিষয় বেছে নেওয়া সোজা হবে যা একদিকে যেমন খুব বিতর্কমূলক নয়, অন্য দিকে তেমনি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা আমায় ব্যাধও করবে না আমার তত্ত্বগুলিকে অনাবশ্যকভাবে জাহির করতে—তবু একই সঙ্গে যা পরিষ্কার করে দেখাতে সক্ষম হবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি বা না পারি। অবশ্য তাতে কতটা সফল হয়েছি বলতে পারব না, এবং নিজেই নিজের রচনার কথা বলে সে-সম্বন্ধে কারুর মতামতকে আমি আগে থেকে প্রভাবান্বিত করতেও একেবারেই চাই না—কিন্তু সে-রচনাগুলিকে যদি লোকে বিচার করতে বসে, তাতে বেশ ভালোই লাগবে। এবং অন্যের পক্ষে সে-বিচারের অবকাশ যাতে যথা সম্ভব বেশি হয়, যাঁরা এই রচনাগুলির ভিতরে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাবেন, তাঁদের সকলকে আমি এই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে রাখছি যে তাঁরা যেন কষ্ট স্বীকার করে তাঁদের বক্তব্যটি আমার প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দেন—সেটা করলে প্রকাশকের মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য জানার সঙ্গে-সঙ্গে সে-বিষয়ে আমার উত্তরটিও আমি সময়মতো যোগ করতে পারব। এবং পাঠক যাঁরা পড়বেন, তাঁরাও এই উপায়ে উভয় পক্ষের উক্তি-প্রত্যুক্তি একত্র দেখার ফলে সত্যের বিচার স্বভাবতই আরো সহজে করতে পারবেন। বড়-বড় উত্তর আমি কখনো পাঠাব না, সে-প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—শুধু যদি দেখতে পাই, নিজের ভুল অকপটে স্বীকার নিশ্চয় করব। কিন্তু সে-ভুল যদি

দেখতে না পাই তো আগে যা লিখেছিলাম, তার সপক্ষে যেটা বলা দরকার মনে করি শুধু সেইটেই বলব—অন্য কোনো নতুন বিষয়ের ব্যাখ্যা সেখানে ঢোকাব না, যাতে এক হতে আরেক বিষয়ে অন্তর্বিহীনভাবে জড়িয়ে না পড়ি।

আমার রচিত "আলোকবিদ্যা" ও "আবহবিদ্যা" নামক দুটি নিবন্ধের গোড়ার দিকে যদি এমন কোনো-কোনো বিষয়ের অবতারণা করে থাকি যা পাঠককে প্রথমেই চমকে দিতে পারে—যেহেতু সেই-সেই বিষয়কে আমি সেখানে অভিহিত করছি অঙ্গীকার বলে এবং তাদের প্রমাণ করার বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছি না—তো পাঠককে আমি অনুরোধ করব, তিনি ধৈর্য ধরে সবটা মনোযোগসহকারে পড়ে দেখুন, এবং আশা রাখি সেটা করলে তিনি শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন। কারণ আমার তো মনে হয় যুক্তি সেখানে আসছে এমন একটার পর একটা, একটি ধরে আরেকটি, যে শেষের দিকের যুক্তিগুলি প্রমাণিত হচ্ছে গোড়ারগুলির দ্বারা, যে-গোড়ারগুলি হল শেষেরগুলির কারণ, এবং একই পারস্পরিকভাবে গোড়ার-গুলি প্রমাণিত হচ্ছে শেষেরগুলির দ্বারা, যে-শেষেরগুলি হল গোড়ারগুলির কার্য বা ফল। এবং এর থেকে এমন কেউ যেন ভেবে না বসেন যে নৈয়ায়িকেরা যাকে বলেন বৃত্ত, সেই ভুলটা আমি করছি এখানে। কারণ পরীক্ষার মাধ্যমে এই কার্য বা ফলগুলির অধিকাংশই যেহেতু অতি নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়, যে-কারণগুলি থেকে আমি অনুমান করছি, সেগুলি ফলগুলিকে যতটা ব্যাখ্যা করতে যায়, ততটা প্রমাণ করে না—বরং উল্টে ঐ কারণগুলিই প্রমাণিত হয় ফলগুলির দ্বারা[৭]। এবং সেই-সেই বিষয়গুলিকে যদি অঙ্গীকার ভিন্ন অন্য কিছু না বলে থাকি তো তার কারণ হল এই যে যে-প্রথম সত্যগুলির ব্যাখ্যা একটু আগে দিয়েছি, তাদের থেকে ঐ বিষয়গুলিকে অনুমান করতে পারি বলে আমি মনে করি এবং লোকে সেটা জানুক তা চাই। তবু এমন কিছু লোক যেহেতু আছে যারা মাত্র একটি দিনে সে-রকম কোনো বিষয়ের আদ্যোপান্ত জেনে ফেলতে পারে বলে ভাবে যা নিয়ে অন্য এক ব্যক্তি বিশ বছর ধরে চিন্তা করেছে এবং সেই ব্যক্তির মুখ হতে বিষয়টি সম্বন্ধে দুটি-তিনটি কথা শুনেই তারা মনে করে সব বুঝে ফেলেছে—এ-ধরনের লোকদের বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র হয়, ততই এরা ভুলের শিকার হয় ও সত্যকে ধরতেও ততই কম পারে—তাই ইচ্ছা করেই আমি উক্ত বিষয়গুলিকে অনুমান করে দেখিয়ে দিতে চাইনি, যাতে তার থেকে ঐ লোকগুলি কোনো বিচিত্র দর্শন খাড়া করে তোলার সুযোগ না পায় এবং সেই দর্শনকে না চালাতে পারে আমারই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, এবং যাতে এইভাবে তাদের দোষ আমার ঘাড়ে কেউ না ফেলে। কারণ যে-মতামতগুলি শুধুই আমার নিজের, সেগুলি-কেও নূতন বলে আমি একেবারেই প্রচার করছি না; বরং এটাই নিশ্চয় জানি, যে-কেউই যুক্তিগুলি একবার মন দিয়ে বিচার করতে বসবে, সে তাদের আবিষ্কার করতে বাধ্য এত সরল ও প্রচলিত অর্থের সঙ্গে এত সঙ্গতিপূর্ণ বলে যে একই বিষয় সংক্রান্ত অন্য যে-কোনো যুক্তির চেয়ে এই যুক্তিগুলিকে তার মনে হবে কম অসাধারণ ও কম অদ্ভুত। এবং এগুলির কোনোটিরই প্রথম আবিষ্কর্তা যে আমিই, এমন বড়াইও আমি করছি না। কিন্তু তবু বলব, যদি তাদের কখনো স্বীকার করে থাকি তো তার কারণ এই নয় যে অন্য কেউ তাদের কথা আগে বলে গেছে বলেই আমিও বলছি, অথবা অন্য কেউ তাদের সম্বন্ধে কখনো কোনো উচ্চবাচ্য করেনি বলেই আমি সেটা করছি—তাদের স্বীকার করার পক্ষে আমার একমাত্র কারণ যা, তা হল এই যে আমার যুক্তি শক্তিই আমাকে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়েছে।

আমার "আলোকবিদ্যা" শীর্ষক রচনাটিতে যে-আবিষ্কারের[৮] কথা ব্যাখ্যা করেছি

তাকে যদি নিপুণ শ্রমিকেরা এখুনি-এখুনি কার্যে পরিণত করতে না পারে তো আবিষ্কার-টিকে সেহেতু মিথ্যা বলা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। কারণ যেসব যন্ত্রপাতির বর্ণনা আমি দিয়েছি, তাদের ব্যবহার করতে গেলে দক্ষতা ও অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, তাতে সূক্ষ্মতম ফাঁক থাকাও চলবে না—তাই একেবারে প্রথম চেষ্টাতেই যদি তাদের ব্যবহার করতে কেউ সক্ষম হয়, সেটাই বরং আমার পক্ষে রীতিমতো বিস্ময়ের কারণ ঘটবে। ঠিক যেমন, স্বরলিপিটা নিখুঁত বলেই যে সেটা দেখে কেউ মাত্র একটি দিনে বীণা বাজাতে শিখে গেল চমৎকার, এমন ঘটনা ঘটতে দেখলে একই রকমের বিস্ময় জাগবে। এবং আমার শিক্ষক-দের ভাষায় অর্থাৎ লাতিনে না লিখে যদি লিখছি ফরাসীতে, যা আমার দেশের ভাষা, তো তার কারণ হল আমার এই আশা যে যারা একমাত্র নিজেদেরই খাঁটি ও স্বাভাবিক যুক্তি-শক্তিকে কাজে লাগায় তারা যতটা ভালো করে আমার মতামতগুলির বিচার করতে পারবে, ততটা পারবে না সেই অন্য শ্রেণীর লোকেরা যারা নাকি দোহাই পাড়ে শুধু প্রাচীন গ্রন্থেরই এবং যাঁরা মেলাতে জানেন শুভবুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানকে, অর্থাৎ যাঁদেরই আমি পেতে চাই আমার বিচারক হিসেবে, লাতিনের জন্য তাঁদের পক্ষপাতিত্ব নিশ্চয় এত প্রচণ্ড হবে না যে এই ইতরজনের ভাষায় ব্যাখ্যা করছি বলেই আমার যুক্তিগুলিকে তাঁরা শুনতে পর্যন্ত চাইবেন না।

এ ছাড়া, ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এগোনোর যে-আশা রাখি, তার সম্বন্ধে এখানে বিশেষ করে কিছু বলতে চাই না—জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধও হতে চাই না এমন কোনো ব্যাপারে যা নিশ্চিতভাবে অর্জন করতে পারব কিনা নিজে এখনো জানি না। শুধু যেটা বলব তা হল এই যে যেটুকু আয়ু এখনো আছে আমার, সেটাকে একমাত্র নিম্নলিখিত বিষয়েই নিয়োগ করব বলে ঠিক করেছি : চেষ্টা করব প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কিছু জ্ঞান অর্জন করতে যার দ্বারা চিকিৎসাবিদ্যার নিয়মকানুনের ব্যাপারে লোকে আজ পর্যন্ত যা জেনেছে, তার থেকে আরো অধিক ও আরো নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়। এবং আমার যা স্বভাব, তাতে আপনা থেকেই আমি এত বেশি দূরে থাকতে চাই অন্য সকল রকম পরিকল্পনা হতে—বিশেষত সেই ধরনের পরিকল্পনা হতে তো বটেই, যা একের পক্ষে উপকারী হতে গেলে অপরের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়ে পারে না—যে তাতে নিজেকে নিযুক্ত করতে বাধ্য হওয়ার মতো উপলক্ষ যদি ঘটেও, আমার তো মনে হয় না আমি সে-ক্ষেত্রে কোনো সফলতা লাভ করতে পারব। এবং তাই সেই ঘোষণাটাই আমি এখানে করে রাখলাম, যদিও ভালো করেই জানি তা আমায় সাহায্য করবে না এ-পৃথিবীতে গণ্যমান্য কেউ হয়ে উঠতে—তবে গণ্যমান্য হওয়ার এতটুকু স্পৃহাও আমার নেই। এবং না চাইতেই যারা আমায় প্রদান করতে পারে এ-পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানের কোনো কাজও, তাদেরও কাছে আমি ততটা কৃতজ্ঞ থাকব না চিরকাল, যতটা নাকি থাকব সেই অন্য-দের কাছে যাদের অনুগ্রহে আমার অবকাশটাকে বাধাহীনভাবে ভোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

পাদ-টীকা

১ গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), যিনি পৃথিবী চলছে বলার জন্য ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে দণ্ডিত হন।

২ যদিও ১৬৩৪-এ মের্সেন-কে (১৫৮৮-১৬৪৮) দেকার্ত লিখছেন এই বলে যে পৃথিবীর গতি-বিধি বিষয়ক জ্ঞান ও অভিমত তাঁর সামগ্রিক চিন্তা ধারার এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ যে সেটিকে বাদ দিলে বাকী মতামতগুলি বিকল ও ভ্রান্ত হয়ে পড়বে।

৩ এ-পদ্ধতির মাধ্যমে, যুক্তিসংগতভাবে, অসংখ্য বস্তু বা প্রাণীর অস্তিত্ব অনুমান করা চলে—যদিও কোন্ বস্তু বা প্রাণী সত্যি-সত্যিই আছে, এবং কোন্‌টি শূন্যে থাকতে পারে, এ-দুয়ের পার্থক্য করা চলে না। সে-পার্থক্য করতে গেলে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দরকার, এবং একবার যখন সেইভাবে প্রমাণ করা গেছে কোনো প্রাকৃতিক বস্তুর অস্তিত্ব, তখন সেই বস্তু হতে দাপে-মাপে উঠে আসা যাবে সেই সব তত্ত্ব বা প্রার্থমিক কারণগুলিতে যাদের উপর বস্তুটি নির্ভরশীল।

৪ মধ্য যুগের দার্শনিকদের শিক্ষণ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে এই সমালোচনা।

৫ আসলে এ-গ্রন্থের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে দেকার্ত আবেদন জানাচ্ছেন যাতে সেই শক্তি তাঁকে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য দেয় তাঁর পরীক্ষাগুলি চালিয়ে যাওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, আবেদন জানাচ্ছেন এই বলেও, যাতে দরকার পড়লে রাষ্ট্র তাঁকে রক্ষা করে সকল রকম নিগ্রহ ও নিপীড়ন হতে।

৬ অর্থাৎ, র‍্যান্ডের।

৭ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দেকার্ত কী ধারণা করতেন, তার আঁচ মেলে এই অংশটিতে। ফল অর্থাৎ কার্যকে প্রমাণের দরকার পড়ে না, কারণ পরীক্ষা করতে গেলেই তার অস্তিত্ব স্বতঃ প্রমাণিত হয়ে দাঁড়ায় —কিন্তু যার দরকার পড়ে, সেটা তাকে ব্যাখ্যা করার। অর্থাৎ সম্পর্ক খুঁজতে হয় সেইসব তত্ত্বের সঙ্গে যাদের থেকে তাকে অনুমান করা চলে। অন্যদিকে, যাকে প্রমাণ করার দরকার পড়ে, তা হল গিয়ে ঐ তত্ত্ব-সমূহের সত্যটি, যাতে তত্ত্বের সঙ্গে ফলকে মেলানো যায়।

৮ কোনো-কোনো পরকলাকে কাটার একটি নূতন ও বিশেষ পদ্ধতি।

শব্দপঞ্জী

এই খণ্ডে ব্যবহৃত কিছু বাংলা শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা এখানে পাঠকদের সুবিধার্থে দেওয়া হল, সঙ্গে সমার্থক ফরাসী ও ইংরেজী শব্দ, আগে ফরাসী পরে ইংরেজী। সব শব্দের সেই অর্থই এখানে দেওয়া হয়েছে যে-অর্থে দেকার্ত তাদের ব্যবহার করেছিলেন বলে অনুবাদক ধারণা করেন।

অংগীকার,	supposition, assumption	দুরকল্পিত দর্শন,	philosophie speculative,
অনুমান করা,	deduire, to deduce		speculative philosophy
আবহবিদ্যা,	meteores, meteorology	দুরকল্পিত বিজ্ঞান,	speculative science
আলোকবিদ্যা,	dioptrique, optics		science speculative,
কারিগর,	artisan, artisan	নিপুণ শ্রমিক,	artisan, artisan
চিকিৎসাবিদ্যা,	medecine, medicine	নৈয়ায়িক,	logicien, logician
চিত্ত,	esprit, mind	পরকলা,	lentille, lens
তত্ত্ব,	principe, principle	পরীক্ষা,	experience, experiment
	মধ্য যুগের দার্শনিকরা,		scolastiques, scholastics
	রীতি,		methode, method
	সম্ভাব্যতা,		vraisemblance, probability

মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : **লোকনাথ ভট্টাচার্য**

স মা লো চ না

মঞ্চের বাহিরে মাটিতে—অরুণ মিত্র। সারস্বত লাইব্রেরী। কলিকাতা-৬। মূল্য ৪.৫০
রাজধানী ও মধুবংশীর গলি—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। সারস্বত লাইব্রেরী। কলিকাতা-৬। মূল্য ৫·০০ টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতাসংকলনে কবির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মণীন্দ্র রায় কবিদের পার্সোনাল ও সিভিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা উল্লেখ করেছেন। 'পার্সোনাল কবিতাকে যদি বলা যায়, প্রধানত নিজের সঙ্গে সংলাপ, তাহলে সিভিক কবিতাকে বলতে হবে, প্রধানত সমাজের সঙ্গে সংলাপ।' ষাট-পেরিয়ে-যাওয়া এই দুই বর্ষীয়ান কবি যেন দুইজাতের প্রতিনিধি। দুইজনেই এক ধরনের জীবনদর্শনে নিষ্ঠাবান হয়েও, একজনের আত্মপ্রকাশ ব্যক্তিগত অনুভবের মধ্যে, অন্যজনের আত্মপ্রকাশ সমাজমনস্কতায়।

অরুণ মিত্রের মতো এমন মৃদুভাষী, স্বধর্মে আন্তরিক কবি বাংলায় বেশি নেই। শব্দের দাপ্তা নেই তাঁর কবিতায়, নেই ভাবালুতা—তাঁর কবিতা অন্তঃশীল মৃদুবাহী, অথচ মৌলিক ভিত্তিসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিবিড়। এমন একলা কবিতা বিরল, অথচ নিসর্গমানুষের সঙ্গে এমন সর্বাঙ্গবিজড়িত। মৃদু, কিন্তু সরল নয়—অনেক বক্র বন্ধুরতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেই গোপন সলিলপ্রবাহের মধ্যে। এই সংকলনের প্রথম কবিতাতেই তিনি বলেছেন 'আমি নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হই।' অরুণ মিত্রের কবিতা এই নিঃশব্দের কবিতা, বলে কম দ্যোতনা জাগায় বেশি। প্রত্যক্ষ ভাষণের কবিতা নয়, তারা পরোক্ষভাবে অন্যদিকে, ভিতরের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে। 'অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মত করে' অরুণ মিত্র বলতে চান। 'মঞ্চে নয়, তার বাইরে মাটিতে দৃষ্টিহীনতার মধ্যে এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে আমি জেগে আছি।' (প্রাজ্ঞের মতো নয়)

তিন গুচ্ছে সাজানো হয়েছে এই অনুভূতিতন্ময় কবিতাসংকলনকে। প্রথম ভাগের আলাদা কোনো নাম নেই, ধরে নিতে পারি বইয়ের নামই এই গুচ্ছের নাম। এই অংশে আছে কিছু অন্তর্গত স্থায়ী উপলব্ধির কথা—'সময়ের এইখানে অবগাহনের কেন্দ্র/গাঢ় থেকে গাঢ়তর নিমজ্জন।' (একটি শিখাও আর)। পটভূমি-নিরপেক্ষ এই সব তপ্তাত উপলব্ধি ও অনুভব,—এখানে ইচ্ছামতো শুধু বাংলাদেশের নদী নয়, কাঁচা মাটি বা গাঢ় পুকুর শুধু বাংলার দৃশ্য নয়। যে 'উদ্ভাসিত প্রান্তে' তিনি দাঁড়িয়ে সেখানে বস্তুময় পটভূমি যেন দ্যুতিময়তায় অশরীরী হয়ে যায়। প্রত্যক্ষ জগৎ এই কবির হাতে প্রতীকী হয়ে ওঠে। অথচ তা অনিকেত বা নিরাশ্রয় নয়। 'যে-কোনো ধ্বনি, তা জলের গতিরই হোক, মাটির বিস্ফারেরই হোক বা তাপের স্পন্দনেরই হোক', তাঁর বাক্যে মিশে যায়। প্রতীকী তাঁর পরিমণ্ডল হলেও বাক্যের জীবনযাপনের মূলের সঙ্গে লগ্ন থাকে। 'পেঞ্জায় হাসি', 'তুলসীতলার পিদিম', 'রাতের সমুদ্দুর'—এই রকম বাললভাষিত মুখের কথায় নয়, বরং এই রকম অপরিচ্ছন্নতা বিরল তাঁর কবিতায়—বাক্‌স্পন্দনের আশ্রয়ে প্রতীক বাস্তবিক হয়ে পরমার্থ পায় সেখানে। একটা প্রমাণ—

প্রপাত আমি দেখিনি। আচমকা জল আর পাথরে কেউ কেউ গন্ডীর আশ্বাস শুনতে

পেয়ে আমাকে এসে বলেছে। কিন্তু ওকথা আমার কাছে যথেষ্ট নয়। আমার নিরিখ এই : আমি তার একান্ত নিকট হতে পারি কিনা, সে কতখানি যন্ত্রণা কতখানি আকুলি-বিকুলি কতখানি ছোঁয়া আমাকে দিতে পারে। এর কোনো সঠিক উত্তর না পাওয়ায় আমি আর আগ্রহ বোধ করিনি। আমার মনে হয়েছে তুমুল লাফের মধ্যে শক্তি অবশ্যই আছে, কিন্তু তার আশেপাশে এমন সব লিপ্সার দৈত্য বড় হয় যারা আমার আত্মার সঙ্গে শত্রুতা না করে পারে না।

নিশ্চয়তার আর এক নাম জন্মভূমি। আমার জন্মভূমি আমাকে হঠাৎ দিশাহারা করে না। (জন্মভূমিতে)

দ্বিতীয় গুচ্ছ 'বেনামা সময়'-এর কবিতাগুলো ইদানীংকার অস্থির সময়ের ভাষ্য। চোখ-রাঙানো পুতুল, কলম-নাচানো পুতুল, আপনি-মোড়ল পুতুল, এই সব নানান জাতের পুতুল সম্প্রতি রীতিমতো মানুষ হয়ে উঠেছে—'ওদের নাচ চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে,/মণ্ডটণ্ড নেই, খুব ঘনিষ্ঠভাবে/ঘরে বাইরে' : আস্তানায় এবং জমায়েতে।' (পুতুল নাচ)। তুমুল হাততালিতে চড়ে আসল জায়গায় যারা পেঁছে যাবে ক্রমেই-উপরে-ওঠা এই সব মানুষের কথা এই গুচ্ছে জায়গা পায়, দর্শক শ্রোতা ঘুরন-বজ্জার কথা, অথবা কাণ্ডানের কথা।

কাণ্ডান, আরও কায়দাসে মিনার ফোঁকো। তোমার গুপনা শুনে দূর দূর থেকে লোক এসে জুটেছে। তোমার ধোঁয়ার খেলায় তাদের তাক লাগানো চাই।

কাণ্ডান, আরও তোড়ে কথা ছাড়ো। তোমার জন্যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি রয়েছে। তোমার মুখে খই ফুটবে আর টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটবে বুকে বুকে। একেবারে বিভুচক্কর লাগিয়ে দেওয়া চাই, কাণ্ডান। (কাণ্ডান, আরও)

এই অনুভূতিতন্ময় কবির স্বরে এই সব জায়গায় এসে গেছে এক বেদনাহত মর্মঘাতী বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। কিন্তু এই অস্থিরতার পরে আবার স্থৈর্যে আত্মস্থ তিনি। 'ছটফটানি বলো, কুঁকড়ে যাওয়া বলো, ঢলে পড়া বলো/আমি বুঝতে পারি এ সবই/সাতসমুদ্দুরে তেরো নদীর প্রশান্তিতে বাঁধা,/এ সবই ঐক্যতানে লীন হয়ে থাকার জন্যে।' (ভারসাম্যে) 'বিশ্বাসঘাতক এলাকা'-য় বাস করেও তিনি এক প্রীতিময় প্রতীক্ষায় টান-টান হয়ে থাকেন। তৃতীয় অংশে তিনি 'ঘরের পৃথিবী'তে প্রবেশ করেছেন। 'এই ছোট উৎস থেকে বেরিয়ে ভালোবাসা পৃথিবীর চওড়া মোহনায় বিস্তৃত হয়েছে।' (ন্যাতাপরা ছেলেমেয়ে)

অরুণ মিত্রের বেশির ভাগ কবিতার মতো এই বইয়ের, দুটো ছড়া ধরনের কবিতা বাদে, সব কবিতাই গদ্যছন্দে লেখা। অনেকগুলো একেবারে গদ্যের মতো সাজানো। বাকিগুলো গদ্যকবিতার মতো বাক্য ভেঙে বিন্যস্ত। এই দুই ধরনের রচনাগুলি যে কবিকৃময় গদ্য নয়, গদ্যে-লেখা কবিতাই, তা প্রমাণের জন্য পত্রান্তর থেকে শঙ্খ ঘোষের সূত্রটি উদ্ধৃত করছি—'গদ্যে, আমরা জানি, লেখকের চেতনা বইতে থাকে হাজার শাখাপ্রশাখায়, তার বিস্তার প্রধানত বাইরের দিকে। অন্তর্মুখী বিষয়কেও গদ্য ধরতে চায় তার বাইরের দিকে উদ্ঘাটন করে। কবিতায় আছে এর উলটো চলন। কবিতা বাইরের বিশ্বকেও আয়ত্ত করতে চায় ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে।' গদ্য আর কবিতার ধর্মের পার্থক্য যদি এই হয়, তাহলে অরুণ মিত্রের প্রচলিত গদ্যের ধরনের এবং গদ্যকবিতার ধরনের রচনাগুলো দুই-ই যে কবিতা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

খটকা লাগে দূরকম ভাবে সাজানোয়—কেন কতকগুলো একেবারে গদ্যের মতো সাজানো আর কতকগুলো কেন গদ্যকবিতার ধরনে সাজানো ? গদ্যকবিতার মতো সাজানো কবিতা-

গুলোকে যদি সরল গদ্যের মতো সাজানো হয়, অথবা যদি বিপরীতভাবে সরল গদ্যের মতো সাজানো কবিতাগুলোকে যদি বাক্য ভেঙে-ভেঙে গদ্যকবিতার মতো সাজানো হয়, তাহলে কী উনিশবিশ হয় ? কেনই বা একজায়গায় গদ্যের চাল, আর অন্য জায়গায় গদ্য-কবিতার চাল কবির কাছে অপ্রতিরোধ্য লাগে ? বাস্তবিক এমন কোনো রূপগত অপ্রতি-রোধ্যতা আছে কি ? দুই রীতির রচনায় একটাই পার্থক্যই চোখে পড়ে। গদ্যে-লেখা কবিতা-গুলোর বাক্য ছোটো-ছোটো কাটা-কাটা। যেমন—

এ সংসারে ঝামেলা বিস্তর। পুরোনো বাড়ি, কোণে কোণে জঞ্জাল। কাজেই এক রত্তি মুঠোয় ঝাঁটা ধরে ঘুর ঘুর। তবু সাফ হয় না। বড়রা অনেক কালের অভ্যেস আঁকড়ে থাকে, খালি জঞ্জাল জমায়। ধুলো ঝুল ঝেঁটিয়ে আনতে আনতে বেরিয়ে পড়ে আরসোলা পিঁপড়ে মাকড়সা। তখন কোমর নুইয়ে একটা পা উঠিয়ে দুম দুম। (ইঁদুর)

গদ্যকবিতায় বাক্যগুলো তুলনায় বড় বড় ঢেউয়ের মতো। চরণে ভেঙে-ভেঙে সেই দীর্ঘ তরঙ্গিত বাক্যের মধ্যে স্তব্ধতার যতি সঞ্চার করে দেন কবি। প্রথম ধরনে দাঁড়িতে শব্দের ভিতরে নিঃশব্দ আসে, দ্বিতীয় ধরনে আসে চরণ থেকে চরণান্তরে যাওয়ার মাঝখানে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের বইটি আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সেই প্রশ্ন মনে ওঠে, কেন কোনো কোনো কবি অবিসংবাদিত শক্তির অধিকারী হয়েও শেষ পর্যন্ত মাইনর থেকে যান ? অন্তঃপ্রেরণার সঙ্গে অনবরত একাগ্র স্বেদময় পরিশ্রম যুক্ত না হওয়াই বোধহয় কারণ। অথচ আপন শিল্পের প্রতি তদ্গত কমিটমেন্টে সেই উৎপাদনশীলতা আসে যা বড় কবির লক্ষণ। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের প্রতিভার ফসল শেষ পর্যন্ত যে এক মুঠি তার কারণ বোধহয় প্রতিভার গৃহিণীপনার অভাব। সঙ্গীতের দাক্ষিণ্যই হয়তো কবিতাকে বিরলপ্রসূ করেছে।

অথচ 'মধুবংশীর গলি' একদিন শম্ভু মিত্রের গলায় বাংলাদেশকে মাতিয়েছিল। মণীন্দ্র রায়ের কথাতে বলছি,—'সেটা ছিল বিদেশী শাসনের নৃশংসতম অধ্যায়, যখন জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় কলকাতায় চলেছে নিষ্প্রদীপ আর নারীমাংসলোভী বিদেশী সৈন্যের আনাগোনা এবং তারই সঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মারার সেই ষড়যন্ত্রমূলক দুর্ভিক্ষ। অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলনেরও তখন তুঙ্গ অবস্থা, আর তারই সঙ্গে মিশে রয়েছে তখন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন, প্রগতিসাহিত্য আর নবনাট্য আন্দোলন। এরই বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত এবং বেদনার্ত প্রতিফলন ধরা পড়েছে মধুবংশীর গলি নামক কবিতার দর্পণে।' (প্রসঙ্গত বলা দরকার, এই উক্তিতে খানিকটা ইতিহাসবিকৃতি আছে—ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে মিশে ছিল না। এই দুই আন্দোলন পাশাপাশি, কখনো-কখনো, পরস্পর-বিরোধীভাবে চলছিল।) ইদানীং অনুরুদ্ধ হয়ে শম্ভু মিত্র আবৃত্তি করতে চাইলেন না এই বলে যে তরুণ শ্রোতারা অনুষঙ্গগুলি জানে না, আর তাই প্রাসঙ্গিক আবেগের অংশী হতে পারে না। তবে কি কবিতাটি তারিখ-চিহ্নিত হয়ে গেছে ? বর্তমান পাঠকের কাছে অন্তত তা মনে হলো না, অবশ্য এমন হতে পারে বর্তমান পাঠক সেই সব অনুষঙ্গ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলেই তার তা মনে হলো না।

মনে হলো, কবিতাটি শুধু সময়ের দলিল নয়, এর মধ্যে আছে বাগর্থসঙ্গীতের সমন্বিত সুষমা। এই একবার অন্তত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছন্দের প্রথাসিদ্ধ গড়নের মধ্যে ভিতরে-ভিতরে বৈচিত্র্য ঘটিয়েছেন, দিতে পেরেছেন সেই স্বকীয়তা যা কবিব্যক্তিত্বেরই ছন্দগত প্রতিফলন। আবেগের প্রবাহ এখানে পরিবর্তন করেছে স্পন্দনের, বাক্‌স্পন্দ তার

ছন্দকে প্রথার বশ্যতা থেকে করেছে মুক্ত। আরম্ভের দুই চরণে অক্ষরবৃত্তের বড় চাল—তোমারই প্রেরণা পেয়েছি/বারে বারে আনন্দে গেয়েছি', তার পরেই তৃতীয় চরণে বলবৃত্তের লঘু চাল—'নিরঙ্কুশ এ জীবনের কলনাদে ভরেছে অম্বর'। অথচ চট করে ধরা যায় না যে একটি মাত্রাধিক্যের জন্যেই এই বদল ঘটে গেল। কোথায়ও এসেছে গদ্যের ধরন—

... হলদে থামে পোরা
শ্রান্ত বিকেলের রং! ছোরা
শানিয়ে আসে রাত্রি,
ধীরে ধীরে বড় রাস্তার চৌমাথা পেরিয়ে,
হিংস্র আগ্নেয় কামনা নিয়ে,—
মত্ত আততায়ী আসে—রাত্রি
অনন্ত পথযাত্রী,—...।

এই সব জায়গায় অক্ষরবৃত্তের গড়ন থেকে সরে যাওয়া আছে, কিন্তু বাঁধনও আছে। মুক্তি ও শাসনের মাঝখানে আসলে যা পাই তা গদ্য নয়, পাই মুক্তবন্ধ ছন্দ। 'বাঁকা টুপিপরা কোনো আমেরিকান/কাপ্তেনের লোলুপ শিস/তরুণী রাত্রির গালে চাবুক মারে। সামরিক আশিস/ঝরে পড়ে বিধ্বস্ত মাথায়,/চালে ডালে কাপড়ে ও মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রায়।' এই সব জায়গায় প্রবহমান পয়ারের অতিনিরূপিত শাসন থেকে স্বাধীনতা নেওয়ায় এসেছে ব্যক্তিগত স্বর। কখনো কবি আনেন মাত্রাবৃত্তের দোলা—'শ্যামলিত কোনো মেদুর সুদূরে/যেন নাই বুঝি পরাণবঁধুরে/স্বল্প আলোকে কান্নায় ঢাকা ব্যথামুকুলিত হাসি।' তারপরেই আবার অক্ষরবৃত্তের বড় বড় ঢেউ। আশাময় শেষ অংশে পাঁচ মাত্রার ফূর্তি—'উড়িয়ে দেবে দিগ্বিদিকে/শুকনো ধুলো/শুকনো পাতা/ঝরিয়ে দেবে।' সঙ্গীতের মুভমেন্টে সমস্ত দীর্ঘ কবিতাটি আশ্চর্য কুশলতায় বিন্যস্ত। বাক্‌স্পন্দনকে আয়ত্ত করা, আর এই সাঙ্গীতিক বিন্যাসই সম্ভবত কবিতাটিকে রক্ষা করেছে কালের কবলিত হওয়া থেকে। বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও নানা ধরনের ছন্দের পারম্পর্য ও সাঙ্গীতিক বিন্যাস আছে। অক্ষরবৃত্তে মাত্রা-সমাবেশের রীতি ভেঙেছেন তিনি, তিনিও কবিতার ভিতর দ্রুত ছন্দ বদল করে নেন। কিন্তু 'মধুবংশীর গলি'-র মতো এত দ্রুত বদল করেন না, অথবা মাত্রার অভ্যাস থেকে এতটা মুক্তি নেন না, যতোটা নিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

বিষ্ণু দে-র কথা বলতেই হলো, কারণ সন্দেহ নেই বিষ্ণু দে-ই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের আদর্শ। দুজনের জগচ্চিত্র এক; দুজনের প্রত্যয়ে মিল আছে, ভঙ্গিমায় সাদৃশ্য আছে। সঙ্গীতের অন্বৈত, যেখানে ধারণা ও ধরন একাকার, তাই দুইজনেরই কবিতার অভীপ্সার বিষয়। এই সব কারণেই হয়তো বিষ্ণু দে-র উদ্দেশে নিবেদিত 'আরোগ্যেই যেন শেষ হয়' কবিতায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বলেছেন, 'সেখানে তোমার মন রেকারের সহস্র ভঙ্গে/আমাকে ছুঁয়েছে।' প্রথম দিককার বিষ্ণু দে-র প্রভাব এই সব চরণে একেবারে স্পষ্ট—'নাঃ মাইরি,/এ হেন দামড়াবাজি আর কতদিন—/মার্কস পড়ে এবং ওরা বোঝে না।/এঙ্গেলস—অ্যান্টিডুরিং—/মাথার দিব্যি আছে, পড়তেই হবে।/আর, একটু সাহিত্যিক জীবনযাপন /দায়িত্ব-স্বামীত্বহীন রিরংসার বেগে।/অ্যালভিংটন বলে—রিচার্ড না পল ?—/মূল-মূল্যহীন হয়ে থাকাই তো সার...। (বহুব্রীহি) এবং উত্তর বিষ্ণু দে-র প্রভাব এই সব চরণে—'এই দুর্বিপাকে/শ্রমে মুক্ত, শ্রমে শুদ্ধ পেশীবান মানুষকে চাই,/অন্যায়ের রক্তস্রোতে, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' (একটি প্রেমের কবিতা) জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতার শব্দনির্বাচনও

বিষ্ণু দে-কে মনে পড়িয়ে দেয়। 'ইউলিসিস হৃদয় আমার', 'ক্ষুরধার স্বপ্নের চূড়া', 'রেশমী পতাকা', 'তন্দ্রা পালায় মদালস স্বস্তির', 'মুখের রেখায় কাঁপে লেনিন-সুষমা, 'চলোর্মি'-মুখর দ্রুত ট্রাফিকের পাকে', 'অরণ্যের ভয়াল ময়াল'—এই সব বাক্যাংশ বিষ্ণু দে-র প্রতিধ্বনিতে মুখর।

প্রভাব আছে, অনেক সময় অনুকরণময় ব্যর্থতা আছে। অনেক দুর্বল চরণ প্রশ্রয় পেয়ে যায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের রচনায়। তাঁর সংগ্রহে আছে 'রাজধানী'-র মতো কবিতা, যার নামডাক খুব, কিন্তু যার ইতিহাসচেতনা তালিকাময় এবং শূন্যগর্ভ। অথচ অনুকরণসর্বস্ব প্রতিধ্বনিপরায়ণ কবিত্ব তাঁর নিয়তি ছিলো না। 'পৃথিবীর রক্তমাংস চক্রহীন-প্রজ্ঞাহীন/পাতালের পথে', 'প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখি অট্টহাসে শমের চূড়ায়/শ্বেত ও ফেনিল', 'সন্তপ্ত মরুর দাহ, বর্ষার দীঘির কিনারে', 'শুধু জ্বলে বনের আগুন অন্ধকার মসৃণ শরীরে/শিকারী চিতার স্তব্ধ চোখের গভীরে—/পত্রঝরা রাত্রির ফাগুন।'—এই সব লাইন যিনি লিখেছিলেন তিনি অনেক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন। দুঃখ এই যে সম্ভাবনার মুকুল বেশির ভাগটাই ঝরে গেল। প্রকাশককে ধন্যবাদ যে তাঁরা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের বই ছাপালেন। নইলে তিনি দুষ্প্রাপ্যতায় কিংবদন্তী হয়েই থাকতেন।

অশ্রুকুমার সিকদার

বিদ্যাসাগর (নির্বাচিত রচনা: সাহিত্য ও সমাজ)। সম্পাদক : অশ্রুকুমার সিকদার ও দেবেশ রায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য পাঁচ টাকা।

উনিশ শতকের বাঙলার রেনেসাঁসের তাৎপর্যময় পুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মকাণ্ডের বহুবিধ আত্মপ্রকাশ তাঁর স্বকালের বাঙালী মানসিকতার অনুমোদন লাভ করেনি; উত্তরকালে যা পরিণত হয়েছে বহু বিতর্কের বিষয়রূপে। স্বভাবতই বিদ্যাসাগর-বিষয়ক কোন গ্রন্থ বা নির্বাসিত রচনাসংকলন একালীন বুদ্ধিজীবীদের বা সাধারণ পাঠকের কাছে সবিশেষ আকর্ষণীয়। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর চিন্তাচর্চার প্রাথমিক পরিচয় হিসাবে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে, সন্দেহ নেই। তদুপরি উক্ত দুটি বিষয়ে যথাক্রমে অশ্রুকুমার সিকদার ও দেবেশ রায়ের ভূমিকা উল্লেখ্য।

মানুষ বিদ্যাসাগর সর্বাংশে সামাজিক ছিলেন এবং ভারতে বৃটিশ শাসনের যথার্থ সূত্রপাতের (১৮১৮) মাত্র দু বছরের মধ্যে তাঁর জন্ম (১৮২০) ও পরবর্তীকালের বহু সামাজিক ও আর্থনীতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর গভীর নৈকট্য, তাঁকে বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত যার পরিণামে রচিত হয় বহুবিষয়ক রচনাবলী, যার মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাদান বা সমাজসংস্কার। কিন্তু তাঁর এমত কর্মের মাধ্যমেই, প্রায় তাঁর অজানিতেই অথবা দেশজ মমত্ববোধে, বাংলা গদ্যও তাঁরই হাতে শ্রীবৃদ্ধি পায়; রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়েও স্বীকার করতেই হয় যে, 'বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।' (চারিত্রপূজা : রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড)। বাংলা গদ্যের এই নির্মাণে ঈশ্বরচন্দ্রের সচেতন প্রয়াসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার (বিদ্যাসাগর, তাঁর গদ্য।)। তাঁর মন্তব্যে, বিদ্যাসাগর গদ্যে রীতিনির্বাচনে, তার উন্মেষে ও ব্যবহারে, অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। একে তো তখন বাংলা গদ্যেরই প্রচলিত তিন রীতির অনাচার—কোনো ঐতিহ্যই তার দাঁড়িয়ে যায় নি, তার উপর আবার 'বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে।...এক দিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙে উজান বহিতেছে...আর এক দিকে ইংরাজীর ভরা গাঙের বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে।' এই সংঘর্ষ দুর্বলকে বিপন্ন করতো, কিন্তু শক্তিধর ঈশ্বরচন্দ্র সেই সংঘাতের মধ্যে সমন্বয়সূত্র পেয়েছেন।' কিন্তু সংশয় থেকেই যায় যে, বিদ্যাসাগরের এই 'সমন্বয়সূত্র' আবিষ্কার কি যথার্থই তাঁর 'সচেতন প্রয়াসের' ফললাভ, না একান্তই সামাজিক হবার সমকালীন প্রয়োজনবোধের কারণজনিত ঘটনাবলীর আকস্মিক ফলশ্রুতি। সংস্কৃত সাহিত্যে যিনি পারংগম, ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে যার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ, তাঁর পক্ষে বাংলা-ভাষার চরিত্র অনুধাবন কিছু দুরূহ নয়; এবং কথ্যভাষার মাধ্যমে অধিক জনসংযোগ সম্ভব, এ-তথ্যও তাঁর অবিদিত ছিল না। স্বভাবতই তাঁর সামাজিক ব্যক্তিত্বের ঝোঁক কোন দিকে অগ্রসর হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয় এবং তাঁর সংসারী মানসিকতা বা জীবনচর্যায় তাঁর প্রশ্রয় ছিল প্রায় প্রথমাবধি; সুতরাং এমত প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের—'তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল'—মন্তব্যের প্রতি অতিগুরুত্ব আরোপে অশ্রুকুমার সিকদার ইতিহাস থেকে বিচ্যুতই হন। সম্ভবত এই কারণেই তিনি মধুসূদনের শব্দব্যবহারের ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে দেখেন কেবলমাত্র 'বেদনাবোধের' অভাব।

অন্যপক্ষে 'সমাজ' অংশের ভূমিকায় দেবেশ রায় (দ্বিতীয় চেতনার নির্বাসনে) অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিনিষ্ঠ, যদিচ নামকরণ থেকে শুরু করে সর্বত্রই তাঁর ঝোঁক কাব্যিক শব্দচয়নে ও বক্তব্যকে ধোঁয়াটে করে তোলায়। অথচ তাঁর হাতে তথ্যের অভাব নেই, তত্ত্বও তার জানিত। 'বিদ্যাসাগর কার্মাটারে সাঁওতাল রমণীর ধুলাজটিল চুলে তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন' বাক্যটি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কোন্ দিক নির্দেশ করে, তা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। এ-ভাবে বহুক্ষেত্রে দেবেশ রায় শব্দব্যবহারের ঝোঁকে তাঁর মূল বক্তব্য থেকে বারংবার সরে গেছেন, যা স্বভাবতই কাম্য ছিল না। তদুপরি তাঁর বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের সমগ্র ভূমিকা 'একেবারেই ব্যক্তিগত' অথবা 'শ্রেষ্ঠ প্রাচীনতার পুনরাবির্ভাব' ইত্যাদি মন্তব্য বহুলাংশেই সামাজিক প্রেক্ষিতকে অস্বীকারেরই নামান্তর। এবং এ-মনোভঙ্গীই শেষ পর্যন্ত তাঁকে লেখায়, 'বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াসে লক্ষ তাই,......(৪) ছোটলাট হ্যালিডে থেকে সুরু করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তরুণ ব্রাহ্মসমাজ, ইয়ংবেঙ্গলদের দল, শালের দোকানী, গ্রামের স্কুলের পণ্ডিত, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, অবশেষে রামকৃষ্ণ-ও ও শেষ পর্যন্ত বালক রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সৌহার্দের সম্পর্কের ক্রমপ্রসারে মানবচর্চার এক নতুন ঐতিহ্যেরই সূত্রপাত।' বিদ্যাসাগর যে সামাজিক প্রেক্ষিতে জন্মেছিলেন এবং যে উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন জন্মসূত্রে, তার স্বাভাবিক সূত্রেই, তাঁর জীবনবোধে ছিল দ্বন্দ্ব, যার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর আজীবনের কর্মকাণ্ডে; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁকে চিহ্নিত করা চলে না এমন এক সামাজিক অবস্থার প্রতিভূরূপে, যা শেষ পর্যন্ত পেছুটানকেই প্রশ্রয় দিয়েছে এবং সে-বিবেচনায় সমকালীন প্রগতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এতই অভিন্ন, যে তা কোনক্রমেই এসে মেলে না রামকৃষ্ণ বা তৎসঙ্গীতের নামগানে। পক্ষান্তরে, তার যথার্থ বিকাশ সম্ভবপর ছিল আধুনিকতার উদ্বোধনে, যা স্বাভাবিক সামাজিক কারণেই রামকৃষ্ণ আর্যসমাজের চোরাগলিতে মুখ থুবড়ে মরে আর পরবর্তীকালের ব্যাখ্যায় একজন দেবেশ রায় সে-ঐতিহ্যের ধারা বহন করেই বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াসকে

চিহ্নিত করেন নিতান্ত 'ব্যক্তি উদ্যোগের ইতিহাস' হিসাবে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারা অনুসরণ করে বিদ্যাসাগরের জীবনচর্যার এমত ব্যাখ্যায়, বিদ্যাসাগর যে রোমান্টিক পুনর্বাসন লাভ করেন, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া স্বভাবতই কঠিন। এবং বিনয় ঘোষ যথার্থই লেখেন, 'ইতিহাসে কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আবশ্যকতাবোধ কখনো কোন ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। সমাজচেতনায় তা তরঙ্গায়িত হতে থাকে, তবেই সমাজচেতন কোন ব্যক্তির পক্ষে সে সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়। বিদ্যাসাগরও ঠিক তাই করেছিলেন। এই সমাজচেতনা যদি সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়, তা হলে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, এই সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের সংযোগস্থলে 'ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে'র উদ্ভব হয়।" (বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ)

এতৎসত্ত্বেও বিদ্যাসাগর-রচনা-সংকলনে সম্পাদকদ্বয়ের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য; বিশেষত সমাজ অংশে, যার অনেকগুলিই মূল ইংরাজী থেকে অনূদিত। অবশ্য পরিশেষে সাধারণ পাঠক বিদ্যাসাগরের জীবন ও তাঁর ঐতিহাসিক পটভূমির একটি নির্ঘণ্টের অভাব বোধ করবেন, যার সংযোজন এখানে অনিবার্য ছিল।

নির্মল ঘোষ